পরমার্থ-প্রসঙ্গ

(ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ)

আনন্দচন্দ্র মিত্র-বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

১।১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

উৎসর্গ।

জগতের সাধু মহাত্মাদিগের চরণে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিয়া,

কৃতার্থ হইলাম।

গ্রন্থকার।
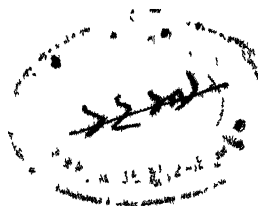
বিজ্ঞাপন।

নানা সময়ে ও নানা উপলক্ষে, ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে গ্রন্থকার যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, বা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী একত্র করিয়া, পরমার্থ-প্রসঙ্গ নামে প্রকাশ করাগেল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধে এক জন সামান্য ধর্ম্মার্থির জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফলের অধিক কিছুই নাই। আমরা বলি, যদি পরমার্থ-প্রসঙ্গ-পাঠে এক ব্যক্তিরও ধর্ম্মজীবন-লাভে কিছু সহায়তা হয়, আমাদিগের যত্ন সফল হইবে।

পূর্ব্বপাড়া ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনামন্দির-নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ গ্রন্থকার পরমার্থ-প্রসঙ্গের প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে, তাহা পূর্ব্বপাড়া-ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণেই ব্যয় হইবে। অতএব যিনি এক খণ্ড পরমার্থ-প্রসঙ্গও ক্রয় করিবেন, তিনিই উক্ত ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রকারান্তরে সাহায্য করিবেন, মনে করিব ইতি।

কলিকাতা, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। প্রকাশক।

সূচীপত্র।

পরমার্থ-প্রসঙ্গ।

ধর্ম্ম ও নীতি।

ধর্ম্ম জনসমাজের জীবনীশক্তি, এবং নীতি উহার [illegible] বন্ধনী স্বরূপ। জনসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য এক দিকে ধর্ম্মবল, অপরদিকে নীতিজ্ঞানের সমান আবশ্যকতা। কিন্তু সামাজিকদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই এই ধর্ম্ম ও নীতির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত নহে।

ধর্ম্ম মানবজাতির এক সার্ব্বভৌম অবলম্বন। মানব-প্রকৃতির অভ্যন্তরে নিহিত বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রাণ। সেই বিশ্বাস প্রত্যেক মানবাত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ, উহা উপার্জ্জিত নহে। জীবশরীরে পাকস্থলীর পক্ষে ক্ষুধা যেরূপ, মানবাত্মার পক্ষে বিশ্বাসও তদ্রূপ। মানুষের বিশ্বাস শিক্ষা, সহবাস, অবস্থা ও আত্মকর্ম্মানুযায়ী হইয়া গঠিত হয়। এই জন্যই ধর্ম্মজগতে বিশ্বাসের এরূপ অভাবনীয় বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়; সহস্র সহস্র লোক যাঁহাকে মুক্তি ও সদ্গতির প্রতিভূ মনে করিয়া, অবিসম্বাদিত চিত্তে যাঁহার পদে লুণ্ঠিত হয়, সহস্র সহস্র লোক হয়ত তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্য দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না!

কোন গ্রন্থ বিশেষের লিখিত উপদেশ বা অনুষ্ঠান-পরম্পরা, অথবা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ও প্রচারিত মত সমূহই ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে ধর্ম্মের "ধর্ম্মত্ব" লোপ পায়, ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইয়া যায়। কতকগুলি মানুষের হৃদয়মনের গঠনের সাম্য, আর অবস্থা, শিক্ষা, চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালীর অপেক্ষাকৃত সমতা বশতঃই, সেই সকল লোকের বিশ্বাস অনেকাংশে একরূপ হইয়া গঠিত হয়; সুতরাং তাহা-দিগের মতেরও অনেকটা একতা হইয়া পড়ে। এইরূপ এক মতাবলম্বী মনুষ্যসমিতিকে এক সম্প্রদায় বলে। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন মনুষ্য যখন কোন অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তখন তিনি অপর সাধারণের হিতার্থে, আপনার বিশ্বাস ও তদনুযায়ী উপদেশ ও অনুষ্ঠান লিপি-বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন; এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের উৎপত্তি হয়। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই অপৌরুষেয় বা আপ্তবাক্য নহে। এই কল্পিত কথার কোন যুক্তি নাই, আর ইহার প্রমাণও থাকিতে পারে না। মানবের ধর্ম্মজীবনের অভি-জ্ঞতা ও অধ্যাত্ম উন্নতির ইতিহাস বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সামগ্রী বটে; কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উক্তি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ বলিয়াই, কোন মত গ্রহণীয়, বা কোন অনুষ্ঠান পালনীয় মনে করা অজ্ঞ ও অসারের কার্য্য। আপনার অন্তরের বিশ্বাস যাহাতে প্রবৃত্ত করে, মানুষের পক্ষে তাহাই প্রকৃতধর্ম্ম।

হিতাহিত-বিচার জ্ঞানের লক্ষ্য। কি সত্য, কি মিথ্যা, কি ধ্রুব কি অধ্রুব, কি মঙ্গলপ্রদ, আর কিই বা অমঙ্গলের হেতু, এইরূপ বিচারের জন্য অনুসন্ধিৎসা, এবং এতদ্রূপ বিচারক্ষমতাকে জ্ঞান বলে। মানবের এই জ্ঞানই জনসমাজে সমস্ত নীতিসূত্রের প্রবর্ত্তক। শরীরের পক্ষে যেমন চরণ ও চক্ষু, আত্মার পক্ষে তেমনই বিশ্বাস ও জ্ঞান দুইটী উপাদান। চলচ্ছক্তি রহিত হইলে যেমন প্রখরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও পাদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধও স্বকীয় পদবলে চলিতে অক্ষম, চলিবার চেষ্টা করিলেও বিপথগামী হইয়া বিভ্রাটগ্রস্ত হয়। অতএব বিশ্বাস ও জ্ঞানে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই বিহিত। যাহার আত্মা বিশ্বাসবলে বঞ্চিত, প্রখর জ্ঞানের আধার হইলেও সে ব্যক্তি জীবনপথে পঙ্গু ও অসহায়। তদীয় জ্ঞানগরিমা কল্পনাতে এবং কার্য্যকালে কাপুরুষতাতেও পরিসমাপ্ত হইতে পারে। এই জন্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পুরুষপুঙ্গব গম্ভীর স্বরে স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"যদি সর্ষপ-কণিকা-প্রমাণ বিশ্বাসও তোমাদিগের থাকে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতকে বলিও 'সরিয়া যাও,' পর্ব্বত আপনি সরিয়া যাইবে।" যিনি এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্য সপ্রমাণ হইয়াছে। দ্বাদশজন মাত্র অনুচর লইয়া বিশ্বাসের বলে সেই সামান্য সূত্রধরপুত্র যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমগ্র ভূমণ্ডলে তাহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে!

পক্ষান্তরে আবার জ্ঞানবিহীন বিশ্বাসও নানা বিড়ম্বনার

আকর স্বরূপ। যাহার অন্তর জ্বলন্ত বিশ্বাসে পূর্ণ, অথচ যাহার জ্ঞান-শক্তি যথোচিত পরিস্ফুট নহে, তাহার বিশ্বাস কুসংস্কারের অন্ধতায় পরিণত হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয়বিহীন দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি যেরূপ নীচ ও নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, সেই ব্যক্তিও ততোঽধিক অস্বাভাবিক কার্য্য সাধন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। সে এক দিকে অতি অসহায়, ও অপর দিকে ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইতে পারে। জ্ঞানীর পক্ষে যেমন সংশয় ও স্বার্থই দুর্ব্বলতা ও স্বেচ্ছাচারের কারণ, তাহারও পক্ষে কুসংস্কারজনিত অমূলক বিভীষিকা, এবং অজ্ঞানতাজনিত অহঙ্কার ও অনুদারতা সেইরূপ ভীরুতা ও অত্যাচারের হেতু হইয়া থাকে।

এই বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্ম, এবং জ্ঞান-মূলক নীতির অনুশাসন ভিন্ন যেমন প্রতিব্যক্তির জীবনের সৌন্দর্য্য থাকে না, সমাজের পক্ষেও তদ্রূপ। সমাজবন্ধনের, সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য ধর্ম্ম এবং নীতির যুগপৎ সমান আবশ্যকতা। পৃথিবীর ইতিহাসে একথার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। জীবশরীর সজীব ও সচেতন রাখিবার জন্য যেমন অম্লযান বায়ুর প্রয়োজন, সমাজকে বলবান করিতে হইলেও সেইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন। কস্মিন্ কালেও কোন নাস্তিক-শিষ্য কোন সমাজশক্তির সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মবলের অভাবে জগতে কোন জাতিই কখনও সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পায় নাই। প্রাচীন ভারতে যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল, ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল।

পুরাতন ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতি যেন ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মের পরিচর্য্যার উপকরণরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ধর্ম্মবলে একবার রোমনগরী সভ্য জগতের শাসন-ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কথিত আছে, রোম-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী যুদ্ধ-দেবতার মন্দিরের দ্বার সমস্ত রোম-রাজত্বকালমধ্যে তিন বার মাত্র অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য-প্রতিপাল্য-প্রথা এইরূপ ছিল,—যখনই রোম-রাজ্যের সঙ্গে কোন প্রতিবেশী রাজ্যের সংগ্রাম উপস্থিত হইত, তখনই যুদ্ধদেবতার মন্দিরের দ্বার দিবারাত্র উদ্‌ঘাটিত থাকিত। পুরাতন কালে—সেই রণকণ্ডূয়ন-সময়ে অতি বিস্তীর্ণ রোমরাজ্যে এরূপ সংগ্রামের আর শেষ ছিল না। রোমের বীর পুরুষেরা রণমদে মত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এদিকে রোম রাজ্যের নগরে নগরে, ঘরে ঘরে দেব-পূজার মহা ধূম উপস্থিত হইত। সভ্য জগতের শীর্ষ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, আমেরিকাও বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চা ও পারলৌকিক গবেষণায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

পরমেশ্বর, পরলোক ও পরমার্থে বিশ্বাসের নামই ধর্ম্মবল। এই তিনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মনুষ্যের আশা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, আত্মনিগ্রহ, ভক্তি, বিনয় ও ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি স্থির ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হয় না। এ সকল গুণের অভাবে জাতীয় অভ্যুদয় বা সামাজিক মঙ্গল সম্ভবে কি? যাহাদিগের ভ্রাতৃভাব নাই, তাহাদিগের মধ্যে কি একতা সম্ভব? যাহাদিগের সৎসাহস

নাই, তাহাদিগের আবার বীরত্ব কি? আর যাহার আশা অনন্ত নহে, তাহার অধ্যবসায় কি সকল অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে? বস্তুতঃ ধর্ম্মবলই বীরত্ব, ধর্ম্মবলের নামই মনুষ্যত্ব। সতী যখন হাস্যমুখে জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিতেন, তখন ধর্ম্মবিশ্বাসই অবলার কোমল হৃদয়ে অলৌকিক দৈববল প্রদান করিত। স্বদেশহিতৈষী বীরপুরুষ পারলৌকিক অনন্ত সুখের আশ্বাসেই, পুত্রকলত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তিরূপে শক্রর অস্ত্র উপেক্ষা করিয়া থাকেন। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের ভীষণ বক্ষে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জে যে সকল নরমাংসাশী মনুষ্য আজিও মনুষ্যজীবন লইয়া ভয়ানক রাক্ষসী বৃত্তির অভিনয় করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারের জন্য আর কে যত্ন করিয়াছে? যাঁহাদিগের হৃদয় ঐশীশক্তি-প্রভাবে পরিপূর্ণ, যাঁহাদের অন্তর ধর্ম্মভাব ও স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবে অলঙ্কৃত, তাঁহারাই সভ্যসমাজের স্বচ্ছলতা ও গৃহসুখলালসা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল রাক্ষসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

ধর্ম্মের শাসন ব্যতীত চরিত্র গঠন করে কে? বিশ্বাস ভিন্ন চরিত্রে বল দেয় কে? যাহারা ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, সামাজিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বচ্ছলতা ঘটাইতে চাহে, তাহারা কি ভ্রান্ত! মনুষ্য-স্বভাবই ধর্ম্ম। ঈশ্বর, পরকাল ও ভ্রাতৃভাব-সাধন সেই স্বভাবের লক্ষণ। স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়া, স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া যাহারা সামা-

জিক্ উন্নতি করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম-সাধনে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মবল-লাভের চেষ্টা না করিয়া, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সমাজ-মধ্যে ধর্ম্মের বল ও ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইচ্ছা ও যত্ন না করিয়া, শত শত বাগ্মী যদি অজস্র বক্তৃতা করেন, শত শত সুলেখক যদি রাশি রাশি প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহাতে সমাজের উন্নতি কখনও হইবে না। জীবন অর্থাৎ স্বকৃত কার্য্য বা ব্যবহার দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিলেই ফল লাভ হইতে পারে। যাহার ধর্ম্মবল নাই, সৎসাহস তাহার পক্ষে অতি দুর্লভ, সন্দেহ নাই। যাহার সৎসাহস নাই, সে ব্যক্তি যদি লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই চতুরতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্ময়ী দেশ-হিতৈষিতা প্রদর্শন করিবে। কিন্তু দেশ বা সমাজের হিত-সাধন কেবল কথায় হইতে পারে না। সমাজের হিতসাধন করিতে হইলে স্বয়ং চরিত্রের বল সাধন করিতে হয়, অপরের চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হয়। এইরূপ করিয়া সকলে মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে; নচেৎ কদাপি নহে।

এইরূপে সমাজের চরিত্রবল সাধন করা, ধর্ম্মবিশ্বাস-সাপেক্ষ। যুক্তিতর্ক দ্বারা মানুষকে সৎকার্য্য ও সৎসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায় না। একথায় যাহারা সংশয় করেন, তাঁহারা বিখ্যাত ফরাশী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন। ইদা-

নীস্তন কালে এমন ভয়ানক সমাজ-বিপ্লব—এরূপ ভীষণ অগ্নি-কাণ্ড আর সংঘটিত হয় নাই। যদি তৎকালে ফরাশী জাতির চরিত্রে বল থাকিত, তাহা হইলে বিপ্লব-কারিগণ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহারা ফ্রান্স-ভূমিকে স্বর্গভূমি করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিত। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের নাম করিয়া তখন তাহারা কি ভয়ানাক লোকহর্ষণ কাণ্ড-পরম্পরাই না সম্পাদন করিয়াছিল!! কিন্তু এত করিয়াও কিছুতেই কিছু হইল না; ফরাশী জাতি আবার যথেচ্ছাচার শাসনদণ্ড শিরোধার্য্য করিল। যখন মানব-শক্তির আগ্নেয়গিরিরূপী নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কার্য্যক্ষেত্রে অভিনয় আরম্ভ করিলেন, তখন চরিত্রহীন বিপ্লব-কারিগণ, চরিত্র-হীন ফরাশী জাতিকে লইয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল, এবং পরিণামে শঙ্কটে পড়িয়া বিষাক্ত বৃশ্চিকদলবৎ পরস্পরের অঙ্গ দংশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এবং এইরূপে আপনাদিগের ধর্ম্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিল! এইরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নহে। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পৌরোহিত্য ও কুসংস্কারের অবতাররূপী-ধর্ম্মের অসুচিত শাসনে ফরাশী জাতি অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মহীন, বিশ্বাসবিহীন হইয়া একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নিদারুণ বিপ্লব ও তদানুষঙ্গিক স্বেচ্ছাচার, সেই দীর্ঘকালের অন্ধ-ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের অসুচিত শাসনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। প্রকৃত ধর্ম্মবল, প্রকৃত চরিত্রবল

না থাকাতেই করাশীজাতি এরূপ গুরুতর আন্দোলন করিয়া, এরূপ অর্থ, সামার্থ্য ও সুখ্যাতির শ্রাদ্ধ করিয়া, পরিণামে এরূপ বিভ্রাট ভোগ করিয়াছিল।

জ্ঞানহীন বিশ্বাস মহা অনর্থের মূল। অন্ধ বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত ধর্ম্মও সমাজকে ধ্বংস করিবার হেতু হইয়া উঠে। জ্ঞানালোচনার অভাবে ধর্ম্ম কুসংস্কার ও কুকর্ম্মের আকর হইয়া পড়ে। তাদৃশ ধর্ম্ম যে সমাজের অবলম্বন, অচিরেই তাহার দুর্গতি ঘটে। ইউরোপের যে সকল দেশে পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক ও ধর্ম্মগুরু পোপের একাধিপত্য দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল, সেই সকল দেশে বহুবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া পরিণামে তাহাদিগকে বিষম বিভ্রাটগ্রস্ত করিয়াছে, কাহাকেও বা একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞানালোচনাবিহীন ভ্রান্তধর্ম্মসংস্কারের অনুরোধে সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বারোহীর ভয়ে একদিন বঙ্গের সিংহাসন বিজাতীয় লোকের করতলস্থ হইয়াছিল! প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের অনুচরদিগের যে বর্ত্তমান সময়ে শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, জ্ঞানালোচনার অভাবই তাহার কারণ। এক দিন মহম্মদের শিষ্যেরা জ্বলন্ত অনলের মত এক হস্তে অসি, এবং অপর হস্তে কোরাণ লইয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানালোচনার অভাবেই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের পরাক্রম নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে বিশ্বাস কুসংস্কার, অনুদারতা ও কল্পনা-প্রিয়তায় পরি-

গত হয়। কুসংস্কার মনুষ্যকে অন্ধ করে, অনুদারতা মনুষ্যকে নিষ্ঠুর করে, এবং কল্পনা-প্রিয়তায় মনুষ্যের চরিত্র শিথিল হইয়া পড়ে। অজ্ঞতা, অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারই যে প্রত্যেক সমাজের পতনের কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গ-সমাজ যেরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্গসমাজ যেরূপ অজ্ঞতা, অনুদারতা, স্বেচ্ছাচার, স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতার প্রেতভূমি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এ সমাজকে উদ্ধার করিতে হইলে—এই সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিতে হইলে, ধর্ম্ম ও নীতির উৎকর্ষ-সাধন একান্ত আবশ্যক। এ দেশে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া জ্ঞানচর্চ্চার কথঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থাই হয় নাই। বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধ-বণিতা স্বেচ্ছাচার, কপটতা এবং ইতর সুখ-লালসাতেই নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যতকাল এ দেশের ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে, এবং শিক্ষামন্দিরে জ্ঞান ও ধর্ম্ম এক যোগে সাধিত না হইবে, ততকাল সৌভাগ্য-সূর্য্যের মুখাবলোকন করিবার আশা বঙ্গবাসীর পক্ষে সত্য সত্যই সুদূর-পরাহত থাকিবে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

কোন কোন লোকের সংস্কার এইরূপ যে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্মের অপচয় হয়। তাঁহারা বলেন, "বিজ্ঞানের আলোচনার যতই বৃদ্ধি হইতেছে, বিজ্ঞান-বলে সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে, জনসমাজ হইতে ধর্ম্ম ততই দূরে যাইতেছে। কেহ বা এতদূর বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই যে, চরমে সভ্য-জগৎ নাস্তিকতা অবলম্বন করিবে!

এই কি সত্য কথা? পরিণামে জগৎ নাস্তিক হইবে! এই কি যথার্থ সিদ্ধান্ত? আমরা বলি—কখনই নহে। কোন বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলেই দুই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, প্রথম যুক্তি, দ্বিতীয় উদাহরণ। এই দুই উপায়েই, আমরা দেখিতেছি, প্রতিপক্ষের কথা বলবৎ থাকে না।

প্রথমতঃ যুক্তির পথেই চলি। মূলে যদি দুই পদার্থে বিরোধ থাকে, তবে সেই দুই পদার্থের মিলন হইতে পারে না। জল শীতল, অগ্নি উত্তপ্ত; জলের প্রকৃতি শৈত্য, অগ্নির প্রকৃতি উষ্ণতা; উভয়ের মূলেই বিরোধ। অতএব জল ও অগ্নির একত্র সমাবেশ হইতে পারে না; হয় অগ্নি নির্ব্বাপিত

হয়, না হয় উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। কথাটী যদিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হইল না, তথাপি আমাদিগের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করাতে ক্ষতি নাই।

ধর্ম্মে এবং বিজ্ঞানে কি এইরূপ প্রকৃতিগত বিরোধ আছে? নাই। ধর্ম্মের মূল কি? না, বিশ্বাস; বিজ্ঞানের মূল কি? না, কি এবং কেন? এই অনুসন্ধিৎসা; ইহার অপর নাম কার্য্যকারণ জ্ঞান। (১) এই বিশ্বাস ও কার্য্যকারণ-জ্ঞানে কি বিরোধ আছে? নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি।

সকলেই আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; এ বিশ্বাস স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের বা ঘটনার সম্বন্ধ, তাহা বিস্মৃত হইয়া কেহ আত্ম-সত্তায় বিশ্বাস করিতে পারে কি? যাহারা মনোবিজ্ঞান ভালরূপে অনুশীলন করিয়াছেন, যাহারা এ বিষয়ে বেশ চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন,—এই যে আমি দেখিতেছি, এই যে আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিতেছি, এই যে আমার মনে চিন্তা ও হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি জন্মিতেছে, এই সকল বিষয়ের জ্ঞান (২) যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে কার্য্য না করিত, তাহা হইলে কেহই আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে

(১) ইংরেজী ভাষাতে যাহাকে Faith ও Reason বলে, তাহাকেই আমরা বিশ্বাস ও কার্য্য-কারণ জ্ঞান বলিলাম।

(২) এইরূপ জ্ঞানকে ইংরেজীতে Consciousness বলা যায়।

পারিত না। অতএব বিশ্বাসের কার্য্যের জন্যই বিলক্ষণ কার্য্যকারণ-জ্ঞানের প্রয়োজন।

যদি বল কার্য্যকারণ-জ্ঞানই আমাদিগের একমাত্র নেতা, তবে আর বিশ্বাস বলিয়া আর একটা পদার্থের নাম কর কেন? তবে অজ্ঞতা না বলিয়া বিশ্বাস বল কেন? যদি বিশ্বাস নামে একটা কিছু থাকিল, তবেত দেখিতেছি, তাহার সঙ্গে কার্য্যকারণ-জ্ঞানের বিরোধ নাই; বরং উভয়ে অপরিহার্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেখানে বিশ্বাসেরও বিকৃতি। দৃষ্টান্ত উন্মাদ। পাগল অনেক অপ্রকৃত কথায় বিশ্বাস করে, আবার অনেক প্রকৃত কথায়ও বিশ্বাস করে না। আমরা এমন চিন্তাশক্তি-বিহীন লোকের কথাও শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ষোড়শোপচারে আহার করিবার পরক্ষণেই "হায়! আজ আমার অন্ন মিলিল না, আমি ক্ষুধায় মরিলাম!" বলিয়া হাহাকার করিয়াছে!! বিশ্বাস কার্য্যকারণ-জ্ঞানের অভাব নহে, উহা প্রকৃত ভাবপদার্থ। একথা পরে বুঝান যাইতেছে। (৩)

যদি বল, বিশ্বাস কার্য্যকারণ জ্ঞানের ফল, তবেত নিজ মুখেই বিশ্বাসের অস্তিত্ব অকাট্য রূপে স্বীকার করিলে। বিশ্বাস কি? বিশ্বাস ত আর মনের কোন সিদ্ধান্ত নয়? উহা মানবাত্মার গতি মাত্র। আত্মার সে গতি যদি কার্য্যকারণ-জ্ঞানের ফলও

(৩) ইংরেজী ভাষাতে, যাহাকে Positive ও Negative বলে, তাহাকেই ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ বলা গেল।

হইত, তাহা হইলেও সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতিতে, সেই বিশ্বাস বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইত, অর্থাৎ ধর্ম্মের উন্নতি হইত। তবে ত আর বিজ্ঞান ধর্ম্মকে সংহার করিতে পারিল না, ধর্ম্মের পথ পরিস্কার করিল মাত্র। বাস্তব কথাও তাহাই, বিজ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিই করিয়া দেয়। তবে বিশ্বাস কার্য্যকারণ-জ্ঞানের ফল নহে, উহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বন্ধ।

যাঁহারা মানব জীবনের সমস্ত কার্য্যকে জ্ঞান বা অজ্ঞতার ফল মনে করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন। কি শরীরে কি আত্মাতে, সর্ব্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, উহাদিগকে সহজসংস্কার বলা যাইতে পারে। আভ্যন্তরিক সহজসংস্কারকে সহজজ্ঞান বলা যায়। (৪) মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, ইহা সহজসংস্কারের কার্য্য। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়, ইহা সহজজ্ঞানের কার্য্য। মানবাত্মার মধ্যে জীবনাশা, প্রীতি ও বিশ্বাস আমাদিগের এইরূপ সহজজ্ঞান। সমাজ-বন্ধনের মূল যেমন প্রীতি, ধর্ম্মের মূল সেইরূপ বিশ্বাস। কার্য্য-কারণ-জ্ঞানলাভে অর্থাৎ সুশিক্ষাতে যেমন প্রীতি বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইয়া সমাজের উন্নতির সহায়তা করে, সেইরূপ বিশ্বাসও বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মোন্নতির সাহায্য করে।

(৪) ইংরেজী ভাষায় যাহাকে, Instinct এবং Intuition বলে, আমরা তাঁহাকে সহজসংস্কার ও সহজ জ্ঞান বলিলাম।

বারম্বার ইহাই মনে করিতে হইবে যে, বিশ্বাস মানুষের কোন সিদ্ধান্ত নহে, কোন গ্রন্থলিখিত কথা নহে। উহা আত্মায় নিহিত স্বাভাবিক বৃত্তি ; ধারণা ও স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তির মত আত্মার স্বাভাবিক এক লক্ষণ। উহার সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নাই। আত্মার এই বৃত্তির এক লক্ষণ নির্ভরশীলতা। এই বৃত্তিই আপনা হইতে মহত্তর শক্তির অস্তিত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। এই বৃত্তির বশেই মানবাত্মা উচ্চতর শক্তির উপরে নির্ভর না করিতে পারিলে যেন সুস্থ হইতে পারে না। এই বৃত্তির প্রথম ও শেষ মীমাংসা জগতের আদিকারণ। (৫) এই বিশ্বাস-বৃত্তির অনুশাসনেই, জ্ঞান ও শিক্ষার বৈলক্ষণ্য অনুসারে, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাবের নানা মূর্ত্তি আমরা মানবসমাজে দেখিতে পাই। জ্ঞান-বৃদ্ধিতে ধর্ম্মভাবের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মকে এড়াইবার সাধ্য নাই। ধর্ম্মও জ্ঞানকে সংহার করিতে পারে না, জ্ঞানও ধর্ম্মকে সংহার করিতে পারে না। কেন না, জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েরই বীজ যুগপৎ মানবাত্মায় নিহিত, এবং উভয়েই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তবে আর বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে বিরোধ কৈ ?

যুক্তি ছাড়িয়া দৃষ্টান্তের দিকে গেলে আমরা কি দেখিতে পাই ? পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই, ধর্ম্ম চিরকাল জগতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। চিরকাল জগতে

(৫) ইংরেজী দর্শন গ্রন্থে আদি কারণকে First Cause বলা হইয়াছে।

কহ মনে করিও না, পৃথিবী হইতে আজ কাল ধর্ম্ম চলিয়া যাইতেছে। চিরকালই মানুষ ভূতকালকে অতিরঞ্জিত দেখিয়া, বর্ত্তমানকে হীন মনে করিয়াছে। আমাদিগের পিতামহগণ বলিতেন, "সে কালে লোকের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, এ কালে তাহা নাই।" আমরাও কখন কখন কার্য্য কর্ম্মে বা লোকের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলি—"আজ কাল আর লোকের ধর্ম্মজ্ঞান নাই!" কিন্তু এ দেশের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বের ধর্ম্মভাবের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মভাবের তুলনা কর দেখি। অসার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি না। যথার্থ ধর্ম্মভাব—যাহাতে আত্মত্যাগের আবশ্যকতা, যাহাতে মানুষের চরিত্র ও সমাজের নীতি উন্নত হয়, তাহার কথা বলিতেছি। রাজর্ষি রামমোহনের সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় যুবকগণ ও বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে কি ধর্ম্মভাবের কিছুই তারতম্য দেখিতে পাও না? ইতিহাস বলে, সময়ে সময়ে ইহার উহার উত্থান পতন আছে বটে, কিন্তু গড়ে জগতে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, তেমনই ধর্ম্মেরও উন্নতি।

তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে কাহার বিরোধ? বিরোধ উপধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম কাহাকে বলি? কতকগুলি মত বা অনুষ্ঠান কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থ প্রচার করে, কতকগুলি লোক তাহাই অখণ্ড্য ও পালনীয় মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করে, আপনাদিগের ধর্ম্মভাব ও স্বাধীন চিন্তাকে কার্য্য করিতে না দিয়া পরের আদেশ

অর্থাৎ সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়। ইহারই নাম উপধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যাহাদিগের নেতা, ও এইরূপ ধর্ম্ম যাহাদিগের ব্যবসায় অর্থাৎ অন্ন-সংস্থান ও মর্য্যাদা-রক্ষার উপায়, তাহারাই বিজ্ঞানের বিরোধী; তাহারাই পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীন চিন্তাকে অভিসম্পাৎ করে। কেননা,জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাহাদিগেরই ঘর ভাঙ্গিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত যথা,—খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বলিতেছে যে, ঈশ্বর ছয় দিনে সমস্ত সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন; আর সে সৃষ্টিও অদ্যাবধি পঞ্চ সহস্র বৎসরের মধ্যেই হইয়াছে। বিজ্ঞান এই ধর্ম্ম-মতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। বিজ্ঞান পৃথিবীর স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া, অন্তরীক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রচার করিতেছে যে, লক্ষ লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের কথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্রান্ত গ্রন্থ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল; সুতরাং এই উপধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ। কিন্তু এক অপরাজিত শক্তিতে, ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ত বিজ্ঞান অস্বীকার করিল না। অলৌকিক কার্য্য যে সকল পৌরাণিক ধর্ম্মের ভিত্তি, (৫) বিজ্ঞান তাহাদিগের পরম শত্রু; কেননা জড় জগতের পদার্থ সকলের গুণাগুণ নিরূপণ ও প্রচার করিয়া, অনেক অলৌকিক কার্য্যকেই বিজ্ঞান-

(৫) প্রকৃতি ইতিহাসের উপরে যাহার ভিত্তি সংস্থাপিত নহে, তাহাকেই পৌরাণিক ধর্ম্ম কহে। অলৌকিক কার্য্য বা miracles এরূপ ধর্ম্মের অবলম্বন না হইয়া পারে না।

৩

লোকের বুদ্ধির আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করেনা; বরং সৃষ্টির গূঢ় রহস্য সকল ভেদ করিয়া, ঐশী মহিমার অনন্ত নিদর্শনই প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়।

বহুকাল অত্যাচার করিয়া, অর্থাৎ অধর্ম্মপথে চলিয়া যাহারা আপনাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞান বিনষ্টবৎ করিয়াছে, তাহারাই ধর্ম্মের শাসনকে ভয় করিযা, এবং ধর্ম্মের মধুরতার স্বাদ না পাইয়া, ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে চায়। অপর যাঁহারা বহুকাল অযত্ন করিয়াছেন, এক দেশে চলিয়াছেন, কেবল চিন্তার পথে, কেবলই কার্য্যকরণ-জ্ঞানের উপদেশে চলিয়াছেন, তাঁহারাও বিশ্বাস ও ভক্তি বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়াছেন, বিকাশ পাইতে দিতেছেন না। তাঁহারা সৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্ত দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু ঐশী শক্তি অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। যাহার চক্ষু ভাল করিয়া ফুটে নাই, সে ব্যক্তি যেমন জগতের দিকে চাহিলে বলিয়া উঠিবে, "অহো! কি দেখিতেছি; কিছুই যে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না!" বর্ত্তমান কালের দুই একজন পাশ্চাত্য দার্শনিকও সেইরূপ বলিতেছেন, "এসৃষ্টি আপনা হইতেই হয় নাই বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিনা, প্রকৃতির এ রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না!" (৬)

(৬) এই রহস্যভেদে-অসামর্থ্যবাদকে Agnosticism বা সংশয়বাদ বলে।

তাই আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকে বলে, "বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।"

বস্তুতঃ, ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ নাই; বিজ্ঞানই ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করে। কিরূপে? ভাবিয়া দেখ, বিজ্ঞান জড়ের জড়ত্ব নাশ করে। মনে কর, প্রকাণ্ড ঝটিকা ও শীলা-বৃষ্টি হইয়া কোন প্রদেশ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইল, বৃক্ষলতা উৎপাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হইল। তুমি দেখিলে, কি একটা কাণ্ড হইয়া গেল; জ্ঞানহীন অশিক্ষিত মনে করিল যে, দেব-দৈত্যের আস্ফালনেই এ বিষম বিভ্রাট ঘটিল! কিন্তু বিজ্ঞান কি বলিবে? বিজ্ঞান বলিবে, এই ঝটিকা কোন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, অপদেবতার কার্য্য নহে। জড়ের কার্য্য বলিয়া যাহা ভাবিতেছ, তাহাই এক নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তির কার্য্য। উত্তাপে পৃথিবীর জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়াছিল, শীতল বায়ুস্পর্শে সেই বাষ্প জলবিন্দু ও শীলা হইয়া ভূতলে পড়িল। উত্তাপেই বায়ু উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিল. প্রবল বায়ুস্রোত উৎক্ষিপ্ত বায়ুরাশির স্থল পূর্ণ করিল; এইরূপে ঝড় বহিল। এই সকল কথা, বিজ্ঞান বলিতেছে; বিজ্ঞান এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিল। কিন্তু এই উত্তাপ কি? বিজ্ঞান কি বলিতে পারে, ইহা জড় পদার্থ বা জড়ের গুণ? বিজ্ঞানের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এখন বিশ্বাস বলিতেছে,—উত্তাপ আর কিছুই নহে, উহা জড়-জগতের পরিচালনার জন্য ভগবানের ইচ্ছায় রচিত এক অদ্ভুত যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। অতএব দেখ, বিজ্ঞান যেমন ভূতের ভয় ও

কুসংস্কার দূর করিল; তেমনই আবার জড়ের জড়ত্ব নাশ করিয়া, অন্ধ শক্তির স্থলে ইচ্ছাশক্তির প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিল।

কেবল কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে বিজ্ঞান দেখিতে পায় যে, জড় কখনও স্বয়ং পরিচালিত হয় না, বিশ্ব-সংসার সার্ব্বভৌম শক্তিতে পরিচালিত হয়। এই সার্ব্বভৌম শক্তি অন্ধ হইতে পারে না, অন্ধ হইলে চলে না। কেননা, এক শক্তির ফলে শক্ত্যন্তর উদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু সকল শক্তির আদিতে ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে চলে না। (৭) এইরূপ শক্তির অভাবে জগৎকার্য্যের পরিচালনা মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না।

বিজ্ঞানকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মকে বিদায় করিতে চাহেন, তাঁহারা জড়বাদী; কেননা দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈত-বাদিদের (৮) সঙ্গে আমাদিগের মতদ্বৈধ থাকিলেও, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। সুতরাং কেবল জড়বাদী-দিগের সঙ্গেই তর্কের মীমাংসা হউক। জড়বাদ ও বিজ্ঞান-বাদ একই কথা। জড়বাদীরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়াই আত্মমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

---

(৭) সার্ব্বভৌম শক্তিকে Universal Force, বুদ্ধি শক্তিকে Intelligent Force আর ইচ্ছাশক্তিকে Will Power বলিলেই বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

(৮) দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীকে ইংরেজীতে Deist ও Pantheist বলে।

জড়বাদীদিগের কয়েকটী আপত্তি আছে; তাহার সকল গুলিই বিচারের উপযুক্ত নহে। কিন্তু দুইটী আপত্তি বেশ গুরুতর; সেই দুইটী আপত্তিকে তাঁহারা অখণ্ড্য মনে করেন। কিন্তু ঐ দুই আপত্তি তদ্রূপ নহে। জড়বাদীদিগের প্রথম আপত্তি এই যে, "যদি ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই জগৎ এক কালে ছিল না। ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি কি তখন ছিল না, কি নিদ্রিত ও মৃতবৎ ছিল?" এই আপত্তি কেন অখণ্ড্য হয়, আমরা বুঝিতে পারি না। ইচ্ছাময় জগৎ-প্রসবিতা ঈশ্বর এক কালে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এইরূপ হউক; ইহাতে ক্ষতি কি? সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কোন এক সময়ে তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যে বিনিয়োগ না করিয়া "আপনাতে আপনি" ছিলেন, ইহা কি অসম্ভব? ইচ্ছা-শক্তি বিশিষ্ট হইয়া এইরূপে থাকা তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কি ঈশ্বরের সম্বন্ধেও তাই? তুমি আমিও তো কিয়ৎকালের জন্য বা কিয়ৎ পরিমাণে "আপনাতে আপনি" থাকিতে পারি। পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা, প্রবৃত্তির দাস ও ঘটনার পুতুল তোমার আমার ইচ্ছার অনুরূপ হয় না কেন, ইহাই কি যুক্তি?

বস্তুতঃ জগৎ এক কালে ছিল না, বলিলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সৃষ্টি-শক্তির অপলাপ হয় না। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, "কখন সৃষ্টি হইয়াছে?" উহা কি আমরা ধারণা করিতে পারি? ধারণা করিতে পারি না, এজন্য যে কাল অনন্ত; কালজ্ঞানের

আদি বা অন্ত আমাদিগের ধারণার বহির্ভূত। অনন্তকাল ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই কি সহজ-জ্ঞানলব্ধ স্রষ্টা বা আদিকারণ অস্বীকার করিব? এ কোন্ যুক্তি?

জড়বাদীদিগের দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি এই যে, "জড় ভিন্ন জড় উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব এই সৃষ্টির স্বতন্ত্র স্রষ্টার কল্পনা মিথ্যা; জগৎ চিরকালই আছে।" (৯) জড় ভিন্ন জড়ের উৎপত্তি হয় না, কিরূপে জানিলে? ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন কেবল জড় কার্য্য করিতে পারে না, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্ষেত্র পতিত আছে, গৃহে বীজ আছে; কর্ষণ ও বপন না করিলে কদাপি শস্য উৎপন্ন হইবে না। আমি ইচ্ছা করি, আর আমার হস্তপদ পরিচালিত হয়; সুখাদ্য ভক্ষণের অভিলাষ করি, আর রসনা-মূলে লালার সঞ্চার হয়। ইচ্ছা ত জড় নয়, আকর্ষণ বা গুরুত্ব প্রভৃতির মত জড়ের গুণও নয়। জড় ভিন্ন অপর কোন পদার্থ যদি জড়ের উপরে কার্য্য করিতে পারিল, তবে সেই পদার্থ, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি জড় উৎপাদন করিতে পারিবে না কেন? আমাদিগের ইচ্ছাশক্তি যদি জড়কে পরিচালিত করিতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমতী ঐশী শক্তি জড় উৎপাদন করিতে পারিবে না, এ যুক্তি ন্যায়ানুমোদিত নহে। তবে যিনি মানবীয় ইচ্ছাশক্তিও অস্বীকার করেন, তিনি প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন। কেহ কেহ বা আপনার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়া দার্শনিক তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তাদৃশ লোকের সঙ্গে বিতণ্ডা করা অনর্থক।

---

(৯) এইরূপ মতকে Positivism বা ধ্রুববাদ বলে।

ভক্তি ও ভাবুকতা।

ভক্তি কাহাকে বলি? হৃদয়নিহিত অনুরাগ বা প্রেমের ঊর্দ্ধদিকে বিকাশই ভক্তি। জল যেমন বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, আবার কখনও শিলা হইয়া নিম্নে পতিত হয়, অনুরাগও সেইরূপ উচ্চদিকে ভক্তি, এবং নিম্নগামী হইলে স্নেহরূপ ধারণ করে। অবস্থা বিশেষে অনুরাগের বিকাশ বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। তাই কবি কহিয়াছেন;—

"একই প্রেম হইয়ে শত ধা বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী হৃদয়ে করয়ে বসতি" ইত্যাদি।

শিশির-বিন্দুতে পতঙ্গপক্ষের উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হয়, দীপালোকও প্রতিফলিত হয়, আবার মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের অসীম কিরণ-জালও প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিন অবস্থাতেই শিশির-বিন্দুর মধ্যে ভিন্নরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সেইরূপ ইতর প্রাণীতে, পিতামাতা-পুত্র-কলত্রে, ও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে হৃদয়ের একই অনুরাগের কার্য্য হয়। পাত্রভেদে কার্য্য করিবার সময়ে হৃদয়ে ভিন্নরূপ প্রক্রিয়া ও হৃদয়ের ভিন্নরূপ

অবস্থা হয়। উহার এক এক অবস্থাকে স্নেহ, প্রণয় বা ভক্তি বলে।

জড় জগতে যেমন আকর্ষণ, অন্তর-রাজ্যে সেইরূপ অনুরাগ। আকর্ষণ-গুণে যেমন জড় পদার্থ অপরকে টানিতেছে, মানব হৃদয়ও সেইরূপ অনুরাগের পদার্থদিগকে টানিতেছে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রভৃতির সঙ্গেও সেই রূপ মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক টান আছে। জড় জগতে আকর্ষণের ফল এই যে, ক্ষুদ্র বৃহতের দিকে ধাবিত হয়। প্রেম রাজ্যেরও বিধি সেইরূপ—যে দিকে টান বেশী, সেই দিকেই গতি। এই জন্য তোমার প্রাণের টানে তোমার শিশু সন্তান তোমার বশ হয়; আর ভগবানের অনন্ত প্রেমের টানে তোমার অন্তর প্রণত ও বশীভূত হয়। কেননা, তুমি বড়, শিশু ছোট; ভগবান মহান অনন্ত, তুমি ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার এইরূপ সম্পর্ক। প্রভেদ এই,—ভৌতিক জগতে যত বড় পদার্থই হউক না কেন, অতি ক্ষুদ্র বস্তুদ্বারাও কিছু না কিছু পরিমাণে আয়ত্ত (Influenced) হয়; আর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম চিরকাল অস্পর্শই থাকেন। তিনিই কেবল অযাচিত ও অপরাজিত ভাবে আমাকে প্রেম করিবেন; আমার অনুরাগ বা বিরাগে তাঁহার উপরে কার্য্য করিতে পারিবে না। আমার সঙ্গে আমার স্রষ্টার এই সম্পর্ক। যখন আমি এই সম্পর্ক অনুভব করি, তখনই আমার হৃদয়পুষ্প বিকশিত হয়, আমার মোহবন্ধন ছিন্ন হইতে থাকে। এই অনুভূতির নাম ভক্তি।

এই ভক্তিই মুক্তির হেতু। ভক্তিবিহীন ঈশ্বরজ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। শাস্ত্রের ঈশ্বর, সমাজ-স্থিতির জন্য ফলাফলবাদীদিগের কল্পিত ঈশ্বর কষ্ট-কল্পনা মাত্র। উহা মানব হৃদয়ের—মানব জীবনের ঈশ্বর নহে। এইজন্যই ভক্ত বলিয়াছেন,—He that loveth God, knoweth Him; for God is Love. "যিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন, কেননা ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ"।

ভক্তি যদি প্রেম হয়, প্রেমের উচ্চ শাখা হয়, তবে ভক্তির উপদেশ কি? ভক্তির উপদেশ আত্মোৎসর্গ। ভগবানে আত্ম-নির্ভর, ও পরার্থে আত্মবিস্মৃতি, ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের উপদেশের সার। ভক্তিতেই ভগবানে নির্ভর, অর্থাৎ দৈববল প্রদান করে। ভক্তিই আত্মত্যাগ অর্থাৎ পরের মঙ্গল-সাধন বা স্বদেশানুরাগের মূলমন্ত্র শিক্ষা দেয়। আজিও এদেশে পিতামাতা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কেবল সন্তানের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য সন্তান-পালন করিতে শিক্ষা করেন নাই। তাঁহারা কেবল সংসারবন্ধন ও অর্থোপার্জ্জন শিখাইবার জন্যই যে কিছু যত্ন করিয়া থাকেন। এজন্যই এদেশের যুবক-গণ এমন কাপুরুষ। নতুবা পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের কথঞ্চিত আশা হইত, সন্দেহ নাই। এদেশে, যখন প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, প্রকৃত ভক্তি ছিল, তখন ভারতবর্ষ জগতের পথপ্রদর্শক ছিল। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ একে-শ্বরবাদ বিলুপ্ত হইয়া, ক্রমে যখন এদেশে কল্পনাপ্রসূত অপকৃষ্ট

পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই এদেশ অধঃপাতে যাইবার পথে পড়িল। ভারতবর্ষ অধঃপাতে গেল—ভক্তিতে নহে, ভণ্ডামী ও ভাবুকতায়। ভক্তি আর ভাবুকতা এক পদার্থ নহে। খদ্যোতকে নক্ষত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া নক্ষত্রালোকের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নয়। ভণ্ডামী কি, সকলেই বুঝিতে পারে। ভাবুকতা কি, তাহাই বুঝাইয়া বলি।

যাঁহারা ঈশ্বর, পরকাল ও পরমার্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মার্থী বলে। ধর্ম্মপথে চলিতে, ধর্ম্মার্থীদিগের মনে নিরন্তর নানা ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। সেই সকল ভাব অনন্ত। তবে আশা, বিস্ময়, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি স্থূল স্থূল কয়েকটীর নাম করিয়া লোককে বুঝান যাইতে পারে। অন্তঃকরণের ঐ সকল ভাবের মধ্যে ভক্তি লুক্কায়িত থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিস্কাররূপে বুঝা যাইবে। ভাবকে যদি খর্জ্জূর-রস বলি, তাহা হইলে ভক্তিকে শর্করা ও ভাবুকতাকে মাদক বলিতে পারি। খর্জ্জূর-রস সিদ্ধ করিয়া ও শোধন করিয়া যেমন শর্করা বাহির করিতে হয়, জ্ঞানানুশীলন অর্থাৎ চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সেইরূপ ভাব হইতে ভক্তি উদ্ধার করিতে হয়। খর্জ্জূর-রস শর্করাতে পরিণত হইলেই, উহা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়; আর দীর্ঘকাল অবিশুদ্ধ থাকিলে উহা বিকৃত হইয়া মাদকে পরিণত হয়। মাদকের গন্ধে বিহ্বলতা জন্মায় বটে, কিন্তু উহা সেবন করিলে বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। ভাবুকতাও সেইরূপ আপাততঃ মধুর, কিন্তু এক-

বার ঐ রোগে ধরিলে মানবাত্মার ভয়ানক অধঃপতন হয়। সুরাপায়ী যেমন বাহ্য লক্ষণে খুব সুখী, কিন্তু গন্তব্য পথে চলিতে পারে না; ভাবুক লোকেরাও অজ্ঞ লোকদিগের নিকটে সেইরূপ পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে জীবনের পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

আরও পরিস্কার করিয়া বলি। ধর্ম্মার্থীর অন্তরে ভাব বলিল—"আত্মত্যাগ কর।" অমনি জ্ঞান আসিয়া বলিল—"যেরূপে ত্যাগ স্বীকার করিলে আত্ম পর সকলের মঙ্গল সাধন হয়, তাহাই কর।" যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ভাব বিকৃত হইয়া, ভাবুকতায় পরিণত হইয়া, যে হস্ত দ্বারা আত্মহিত ও পরের পরিচর্য্যা করা যায়, সে হস্ত নষ্ট করিয়া লোক ঊর্দ্ধ-বাহু হইল। ভাব বলিল—"ঈশ্বর পিতা, মাতা ও বন্ধু, অতএব ঈশ্বর সাক্ষাৎ ব্যক্তি।" জ্ঞান আসিয়া তখনই বলিল—"অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ভাব ও অনন্ত ইচ্ছাকে ব্যক্তি বলিয়া জান; এই তিনের সহযোগে যে বিশ্বপরিচালক মহাশক্তির কার্য্য হইতেছে, সেই মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ ব্যক্তি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর।" যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ভাব ভাবুকতায় পরিণত হইয়া, ভগবানকে সুখদুঃখ ও অদৃষ্টের অধীন মনুষ্যরূপে কল্পনা করিল। সূর্য্য কি, না জানিয়া বালকেরা যেমন সূর্য্যের কল্পনার সঙ্গে খেলা করে, মানুষ ভগবানের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল।

কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ভক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয়ের অনুরাগই ভক্তের ধর্ম্মসাধনের উপকরণ;

কিন্তু ভাবুক অনুষ্ঠানপ্রিয়, অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব। অনুষ্ঠানবিহীন হইলে, মানুষের চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ নিষ্ঠাবিহীন হইয়া পড়ে। এজন্য ব্যক্তিগত জীবনে, বিশেষতঃ জনসমাজে অনুষ্ঠানের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন-জ্ঞানে অনুষ্ঠান পালন করা, আর অনুষ্ঠান না হইলেই ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ না হওয়া, এক কথা নহে। প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে যাহারা বিচ্যুত, তাহারাই জপ, তপ, যজ্ঞ, উপবাস ও অভিষেকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহারা ধর্ম্ম চাহে বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপথ,—হৃদয়, মন ও বিবেকের ধর্ম্ম হইতে দূরে রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে তত্ত্বজ্ঞ ও ভক্ত বলিয়া যাঁহারা পূজিত, তাঁহারাও এ কথার সাক্ষী। ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

"ন কায় ক্লেশ বৈধুর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ
কেবলম্ তন্মনোমাত্র জয়েন সাদ্যতে পদম্।"

অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ, কাতরতা বা তীর্থবাস দ্বারা ঈশ্বরলাভ হইতে পারে না; কেবল মনকে জয় করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

উপবাস ও বার-পালন সম্বন্ধে ভক্তশ্রেষ্ঠ ঈশা বলিয়াছেন,—

"Can the children of the bride-chamber fast, while the bride is with them?"

"The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath."

"কন্যা উপস্থিত থাকিলে কি আর বাসর-গৃহের শিশুগণ অভুক্ত থাকিতে পারে?"

মানুষের জন্যই বিশ্রাম বার, বিশ্রাম বারের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই।"

ভক্ত কবি তুলসীদাস কহিয়াছেন,—

"পাথর পূজনেছে হরি মিলে তো,
মৈঁ পূজো পাহাড় ;
মালা ফিরাণে মে হরি মিলে তো,
মৈ ফিরাও ঝাড়।"

আর ধর্ম্মপথের প্রবেশার্থী আমরা, আমরাও বলি,—

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা ;
বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা ?"

মহাভারতে একটী গল্প আছে, তদ্দারা ভক্তি ও ভাবুকতার প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝা যায়। গল্পটী এইরূপ,—একদা দেবর্ষি নারদ গোলোকে যাইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ভগবন্, সর্ব্বাপেক্ষা কে আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ?" তদুত্তরে কৃষ্ণ পৃথিবীর একজন কৃষকের নাম করিলে, নারদ মুনি ভক্তশ্রেষ্ঠকে দেখিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া সেই কৃষকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নারদ দেখিলেন, কৃষক ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপনাদি করিয়া প্রতিদিন সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ ও পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতেছে, এক দিনও অনেকক্ষণ বসিয়া ভগবানের নাম জপ বা গুণকীর্ত্তন করে না। নারদ মুনি গোলোকে ফিরিয়া গিয়া কৃষ্ণকে গুরুতর অনুযোগ করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, তোমার

অদ্ভুত বিচার! যাহারা দিবানিশি তোমার নাম গান করে, তাহারা তোমার নিকৃষ্ট ভক্ত, আর যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একবারও তোমার নাম করে না, সে হইল তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত!” কৃষ্ণ এ কথার উত্তর না করিয়া, অত্যুষ্ণ দুগ্ধপূর্ণ একটী কটাহ স্থানান্তরে রাখিতে নারদকে আদেশ করিলেন। নারদ আদেশ পালন করিলে, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই কার্য্য ব্যপদেশে তুমি কত বার আমার নাম স্মরণ করিয়াছ?” নারদ কহিলেন, “একবারও নহে।” তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া নারদকে বলিলেন,—“তুমি এই সামান্য উত্তপ্ত দুগ্ধ কটাহ স্থানান্তরিত করিতে যাইয়াই আত্ম-চিন্তায় আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ; আর ঐ যে কৃষক, সে সংসারের দুঃখ-দরিদ্রতা ও পরিশ্রমের মধ্যে আমাকে নিয়ত হৃদয়ে রাখিয়াছে। দেখ দেখি, কে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত?”

এই কল্পিত উপন্যাসে একটী সত্য লুকায়িত আছে। প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত সহস্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেও সদ্গতি লাভ হইতে পারে না। অনুষ্ঠানের উপকারিতা গৌণ ও সামান্য, এবং অনুষ্ঠান সর্ব্বদা অবশ্য-প্রতিপাল্য নহে। কিন্তু অনুষ্ঠানই যাহাদিগের জীবনের অলঙ্কার, এবং অনুষ্ঠান না করিলেই যাহাদিগের ধর্ম্মভাব কোনরূপে তৃপ্ত ও চরিতার্থ হয় না, তাহারা নিম্ন স্তরে অবস্থিতি করিতেছে; প্রকৃত ভক্তিমার্গ হইতে তাহারা বহু দূরে রহিয়াছে।

ভাবুকতার দ্বিতীয় লক্ষণ, ভাব অপেক্ষা ভাষাতে অধিক

আস্থা। যে পরিমাণে মানুষ মৃত্যুকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ মানুষ জ্ঞানহীন হয়, সুতরাং মানুষের ভক্তি ম্রিয়মাণ হয়, সেই পরিমাণে মানুষ উপদেশ বা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম হইয়া, উহার ভাষাগত অর্থ পালন করিতে যত্ন করে। তাহাতেই সাধক বলেন—"The letter killeth, but the spirit giveth life." অর্থাৎ ভাব মানুষকে জীবন দান করে, কিন্তু ভাষা আশ্রয় করিলেই মানবাত্মার মৃত্যু সংঘটিত হয়। সরল বিশ্বাস ও ভক্তি হারাইয়া যখন মানুষ শাস্ত্র-বাক্যাদি পালন করিতে অধিক যত্ন করে, তখনই জানিবে, তাহার ধর্ম্মভাব হীন ও বিকৃত হইয়াছে, তাহাকে ভাবুকতারূপ রোগে ধরিয়াছে, তাহার অধ্যাত্ম মৃত্যু মস্তকোপরে।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই খানি গ্রন্থের তুলনা করিলে আমরা ভক্তি ও ভাবুকতার প্রভেদ সুন্দররূপে বুঝিতে পারি। রামায়ণে সর্ব্বত্রই সরল বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয়। মহাভারতে কথার আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি; কিন্তু প্রকৃত ভক্তি, ধর্ম্মের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অধিক নাই। রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি কঠোর তপস্যা করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার চিত্রগুলিতেও প্রকৃত ভক্তি আছে। ব্যাস চরিত্রবান সাধু পুরুষ ছিলেন না, ভক্তি কাহাকে বলে ভাল জানিতেন না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ কল্পনাপটু ও নানা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এজন্য তাঁহার চিত্রগুলি ভাবুকতাতে গঠিত। ব্যাস ধর্ম্মনীতির কত কথাই কহিয়াছেন, কত কথাই কহাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত

ভক্তের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্মীকির রাম আর ব্যাসের যুধিষ্ঠিরে কত প্রভেদ! রামচন্দ্র ভাব ও ভক্তির প্রতিকৃতি স্বরূপ, আর যুধিষ্ঠির ভাষার পুতুল, ভাষার দাস। ভক্ত রাম বনে গেলেন পিতৃসত্য পালন জন্য, আর যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতার সহিত মিলিয়া এক রমণীকে বিবাহ করিলেন—মাতৃ-আজ্ঞা পালন জন্য! একজন দেখিলেন ভাব, আর একজন দেখিলেন ভাষা। ভাবুকের কি শোচনীয় অবস্থা! ভাষাই ভাবুকের সর্ব্বস্ব। "বিল্বপত্র" "বলিদান" প্রভৃতি শব্দ মুখে আনিতেও ভাবুকের সংকোচ! কিন্তু ভক্ত বলেন,—

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা-মধ্যে তোমারে দেখিয়ে ডাকি।"

ভাবুকতার তৃতীয় লক্ষণ কথায় ও কার্য্যে প্রভেদ। জীবনের সমস্ত ঘটনায় ভক্ত উপাস্যে তদগত। ভক্তের নিয়ত প্রার্থনা "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ভাবুক ঈশ্বরকে মনগড়া করিয়া লয়। ভাবুকের প্রার্থনা, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" ভক্ত সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণ; প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য-সাধন-স্পৃহা যুগপৎ ভক্তের অন্তরে কার্য্য করে। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ" ভক্তের জীবন। প্রকৃত ভক্ত হনুমান, হৃদয়বিদীর্ণ করিয়াও তন্মধ্যে উপাস্যের নাম অঙ্কিত দেখাইতে পারেন, আবার উপাস্যের জন্য আজ্ঞামাত্রে সমুদ্র-লঙ্ঘন করিতে পারেন। ভাবুক তাহা পারে না। ভাবুকের ভাব চর্ম্মতলে অবস্থিতি করে। ভগবানের নাম করিতেই ভাবুকের

চক্ষে জল আইসে, হরিধ্বনি শ্রবণ-মাত্রেই কণ্ঠ হইতে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মার্থে ত্যাগ স্বীকার করিতে, ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য-সাধনে তাহার মস্তক হেঁট হয়! এরূপ ত হইবেই! ভাবুকতা রক্ত-মাংসে ক্রীড়া করে, মানুষের চরিত্র গঠিত করে না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-বিশোধিত ভাব ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া, আত্মার মর্ম্মে মর্ম্মে অর্থাৎ জীবনের মূলদেশে গিয়া কার্য্য করে। ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রাক্ষসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। আব মস্তক-মুণ্ডন বা স্বপাক-ভক্ষণ করিয়া ভাবুকের ভাবুকতা তৃপ্ত হইতেছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, রূপতৃষ্ণা বা যশস্পৃহায় না হইলেও, ধর্ম্মাভিমানে তাহার অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে। ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে ভাবুকের কষ্ট নাই, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই হয়তো তাহার দশা উপস্থিত হইবে; কিন্তু এক রাত্রি জাগরণ করিয়া বিসূচিকার রোগীর শুশ্রূষা করিতে বলিলে, তাঁহার মাথায় বাজ পড়িবে! প্রকৃত সাধুদিগের জীবনই ধর্ম্ম।

ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মোপদেষ্টা।

লক্ষ্যপথে গতিকেই উন্নতি বলিতে হয়। জীবনের লক্ষ্য-পথে গতি বা জীবনের উন্নতি কাহাকে বলে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। কেহ মনে করিতে পারে যে, যে কোন প্রকারে দৈহিক বল বৃদ্ধি বা দেহের পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারিলেই জীবনের উন্নতি হইল। এইরূপ যাহার বিশ্বাস, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিব," ইহাই তাহার নিকটে জীবনের উন্নতির মূলমন্ত্র হইতে পারে। কেহ মনে করিতে পারে যে, যেন তেন প্রকারেণ বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করিতে পারিলেই জীবনের প্রচুর উন্নতি হয়। এইরূপে কেহ বা বিচক্ষণ তর্ক-শক্তি সম্পন্ন হইয়া, আর কেহ বা ভাবোন্মাদে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াও মনে করিতে পারে, এবং মনে করিয়া থাকে যে, তাহার জীবনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে। কিন্তু কে না জানে যে, দৈহিক বল, বিপুল বৈভব, তার্কিকতা বা ভাবুকতা অনেক সময়ে মানব জীবনের উন্নতির পরিচায়ক না হইয়া, অধোগতিরই ফলরূপে গণ্য হইতে পারে?

জীবনের উন্নতির এইরূপ সংজ্ঞা করা যাইতে পারে। মঙ্গলই জীবনের লক্ষ্য। বিকাশ এবং সামঞ্জস্য সেই লক্ষ্য-সাধনের প্রক্রিয়া। মানবের চিত্তবৃত্তি সকলের বিকাশ এবং সামঞ্জস্য দ্বারা সেই মঙ্গলের দিকে যে গতি, তাহারই নাম জীবনের উন্নতি। যে পরিমাণে আমাদিগের এই গতি ঠিক থাকে, সেই পরিমাণে আমরা জীবিত, আর যে পরিমাণে আমরা এই গতির বামে বা দক্ষিণে সরিয়া যাই, সেই পরিমাণে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকি।

বিকাশ ও সামঞ্জস্যের একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বিশদ হইবে। মানবদেহে যেমন হস্ত পদ ও চক্ষু, এই তিনটী ইন্দ্রিয়, মানবাত্মাতেও সেইরূপ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই তিনটী বৃত্তি আছে। যাহার চক্ষুতে দোষ আছে, সে দেখিতে পায় না, সুতরাং আজানুলম্বিত বাহুযুগল এবং বলবান পদদ্বয় থাকিলেও, সে আশানুরূপ কর্ম্মঠ হইতে পারে না। আর যাহার প্রখর দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু যাহার হস্তদ্বয় বিকল বা পদদ্বয় ক্ষীণ, সেও আশানুরূপ কর্ম্মক্ষম নহে। সেইরূপ আবার যাহার দৃষ্টিশক্তি ও চলচ্ছক্তি উভয়ই প্রবল, কিন্তু হস্ত দুই খানি ক্ষীণ বা অসার, সে ব্যক্তি চলিতে চলিতে হঠাৎ গর্ত্ত-মধ্যে পতিত হইলে আর উঠিতে পারে না; সুতরাং সেও নিতান্ত অসহায় অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই।

মানবের আত্মার অবস্থাও ঠিক এইরূপ। যাহার জ্ঞানরূপ চক্ষু প্রস্ফুটিত নহে, তাহার ভক্তিরূপ পদ বিলক্ষণ বলবান হই-

লেও, সে যথাপথে চলিতে পারে না ; যাহার জ্ঞানচক্ষু প্রখর, কিন্তু ভক্তি ও প্রীতিরূপ পদদ্বয় ক্ষীণ, সে জীবন পথে পঙ্গু-সদৃশ ; আবার যাঁহার জ্ঞানদৃষ্টি প্রখর, এবং ভাব ভক্তিও বিলক্ষণ প্রবল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তিরূপ হস্ত দুইখানি অসার, সে ব্যক্তি বিচক্ষণ দার্শনিক বা ভাবুক-চূড়ামণি হইলেও, জীবন-পথে অকর্ম্মণ্য, আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনখানি পায়া সমান সবল এবং সমদীর্ঘ হইলেই, সেপায়া খানি মজবুত হয়, মাটিতে ভালরূপে বসে, এবং সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে।

কিন্তু এই বিকাশ ও সামঞ্জস্য কি কেবল মানবের ধর্ম্ম-জীবনেই প্রয়োজনীয়, অন্যত্র নহে ? মানবের ধর্ম্ম-জীবনে এবং সাধারণ জীবনে কি প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্যের ব্যতিক্রম আছে ? আমরা বলি, নাই। পৃথিবীর একদেশে জলবায়ু বা সূর্য্য-রশ্মির যে ধর্ম্ম, অন্য দেশেও তাহাই। সেইরূপ মানবের ধর্ম্মজীবনে বিধাতার বিধি যেরূপ কার্য্যকারী, মানবের সাধারণ জীবনেও তাহাই। কিন্তু জানি না কি কারণে, ধর্ম্মাচার্য্যেরা অনেকেই মানবের সাধারণ জীবনকে এক বর্ণে, এবং ধর্ম্মজীবনকে অন্য বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। অনেকেরই এইরূপ ধারণা যে, জীবনের অন্যান্য বিভাগে যে সকল বিধি ব্যবস্থা মানিলে, যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে মানুষের চলে, ধর্ম্মসাধন-বিভাগে তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার, এমন কি, কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত বিধি বা উপায়ের অধীন হওয়ার প্রয়োজন। এজন্য অনেক স্থলে ধর্ম্মাচার্য্য এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের আচার, অনু-

ষ্ঠান, এমন কি বেশভূষা পর্য্যন্ত অনন্য-সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। মানবের ধর্ম্ম-সাধনরূপ কার্য্যকে মানব জীবনের সাধারণ বিধির বহির্ভূত কল্পনা করিয়া লওয়াতে, জগতের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এইরূপ করিতে যাইয়া, ধর্ম্মকে অনেক স্থলে অতি উৎকট বেশে সাজাইয়া নির্ম্মম রাক্ষসের মূর্ত্তি প্রদান করা হইয়াছে; অনেক স্থলে ধর্ম্মের নামে কদাচার, কপটতাও নীতিহীনতা প্রশ্রয় পাইয়াছে। আর যাহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মাচার্য্য বা ধর্ম্মসাধক মনে করে নাই, তাহারা আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রজা মনে করিয়া, বহু বিষয়ে আপনাদিগের আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া লইয়া, হীন ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মজগতের লোক নহ, বহির্জগতের লোক; যত দিন বহির্জগতে আছ, তোমার অনন্যগতি বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ তুমি যদি না কর, তুমি অপরাধী; কিন্তু ধর্ম্মসাধন করিতে যাইয়া তুমি যদি ঐরূপ কর্ত্তব্যের অবহেলা কর, তুমি অপরাধী হইবে না। সুরাপান বা গঞ্জিকা-সেবন করিলে সাধারণ লোকের অপরাধ হয়, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে ঐরূপ কার্য্য করিলে মানুষের সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, এইরূপ ধারণাও অনেকের আছে! ধর্ম্ম-ধর্ম্মজীবন ও সাধারণ জীবনের পার্থক্য-জ্ঞান যে কিরূপ অনিষ্টকারী, একটী আমোদজনক গল্পের উল্লেখ করিলেই, তাহা বুঝা যাইবে। মফঃসলবাসী একজন জমিদার কলিকাতাতে আসিয়া অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বাস

করিতেছিলেন। ভূম্যধিকারী মহাশয়ের জমিদারির আয় লক্ষ মুদ্রারও অনেক কম ছিল। কিন্তু তাঁহার চাল চলন দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে কোটীশ্বর মনে করিত। একদিন গঙ্গাস্নান-কালে একজন সরল প্রকৃতি প্রতিবেশী জমিদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাঁহার জমিদারির আয় কত? প্রকৃত আয়ের কথা বলিলে তাঁহার সম্ভ্রম কমিয়া যায়, অথচ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথাই বা কিরূপে বলিবেন, এই সঙ্কটে পড়িয়া জমিদার মহাশয় প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের বলে এই বলিয়া সত্যের আবরণে মিথ্যা কথা বলিলেন যে, তাঁহার জমিদারির আয় "লক্ষ নয়!" বক্তার মনের ভাব এক লক্ষও নয়, কিন্তু সরলমতি শ্রোতা মনে করিলেন, ন্যূনাধিক 'নয়' লক্ষ হইবে। ভূম্যধিকারী মহাশয় যদি গঙ্গাজলে না নামিতেন, অনায়াসেই মিথ্যা কথা কহিতে পারিতেন। কিন্তু গঙ্গাজলে নামিয়াছিলেন, সুতরাং মিথ্যা কথা কহিবার তাঁহার সুবিধা ছিল না! সুতরাং সূক্ষ্ম কপটতার আশ্রয় লইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন!!

ধর্ম্মজীবনে ও সাধারণ জীবনে পার্থক্যের সৃষ্টি করাতে লোকে মনে করে, ধর্ম্মজীবনে যেরূপ ব্যবহার দূষনীয়, সাধারণ জীবনে তাহা সেরূপ দূষনীয় নহে। এই জন্যই আমাদিগের দেশের কোন কোন লোকের ধারণা এইরূপ যে, ব্যবসায় করিতে গেলে মিথ্যা কথায় দোষ নাই। এই পার্থক্য হেতুই লোকে মনে করে যে, সাধারণ জীবনে যে পন্থা অবলম্বন করিলে দোষ বা ক্ষতি হয়, ধর্ম্মজীবনে তাহার সঙ্গে বিসদৃশ পন্থা অবলম্বন করিলেও, তেমন

দোষ বা ক্ষতি হয় না। নীতি ও ব্যবহারের এইরূপ বিরুদ্ধতা দেখিয়াই, অল্পবুদ্ধি লোকেরা এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, "মানুষের পক্ষে যাহা পাপ, দেবতার পক্ষে তাহাই লীলা!"

আমরা বলি, মানবের ধর্ম্মজীবনেও সাধারণ জীবনে একই বিধি সমানরূপে কার্য্য করে, এবং সমফল প্রদান করিয়া থাকে। সাতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করিলে যে সাধারণ জীবনে বার, আর ধর্ম্মজীবনে চৌদ্দ হইবে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষা বা বিষয়কার্য্য-শিক্ষা করিতে হইলে যেরূপ বিধির অধীন হওয়া, বা যেরূপ পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মশিক্ষা অথবা ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিতে হইলেও, সেইরূপ বিধির বশীভূত হইয়া, ঠিক সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

কোন বিষয়ে শিক্ষা বা উন্নতিলাভ করিতে হইলে, এই চারিটী তাহার উপায়। প্রথম শাস্ত্র, দ্বিতীয় উপদেষ্টা, তৃতীয় স্বাধীন চিন্তা, এবং চতুর্থ অনুষ্ঠান। কোন ব্যক্তিকে যদি অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে অঙ্ক-শাস্ত্রের গ্রন্থপাঠ করিতে হয়, উপদেষ্টার নিকটে কৌশল বুঝিয়া লইতে হয়, নিজে নিজে বসিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং স্বহস্তে আঁক কসিতে হয়। কোন ব্যক্তি যদি বৈষয়িক শিক্ষা লাভ করিতে চায়, তাহা হইলেও তাহাকে বিষয়ী লোকের জীবন-চরিত পড়িতে হয়, বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়; বিষয়-

ব্যাপার লইয়া চিন্তা করিতে হয়, আর বিষয়-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে হয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা বা গুরুর নিকটে উপদেশ লইতে হয়, স্বাধীন ভাবে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়, আর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। মানব জীবনে সকল বিভাগেই, শিক্ষা বা উন্নতির এই চারি উপায়,—শাস্ত্র, উপদেষ্টা, চিন্তা ও অনুষ্ঠান। ধর্ম্মসাধনেও তাহাই। জীবনের সকল বিভাগেই এই সকল উপায়ের সদ্ব্যবহার করিলে সুফল ফলে, অপব্যবহার করিলে কুফল ফলিয়া থাকে।

ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে শাস্ত্র, উপদেষ্টা বা গুরু, চিন্তা বা ধ্যান, এবং অনুষ্ঠান বা কার্য্য, এই চারিটীর কোনটীই উপেক্ষণীয় নহে। ইহার কাহাকেও উপেক্ষা করিলে বা অনুচিত প্রাধান্য দান করিলে, পূর্ব্বে যে সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছি, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং জীবনের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়া থাকে। মানবজাতির ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্র। স্বয়ং মৃত না হইলে, কেবল পুরাতন অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক মৃত্যু-মুখেই পতিত রহিয়াছে; এজন্যই তাহারা শাস্ত্রের এত মুখাপেক্ষী। মৃত এবং শুষ্ক বৃক্ষ মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া থাকে, আর সজীব বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া নিত্য

নূতন আহার্য্য গ্রহণ করে। মাটির উপরে থাকা তাহার পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, সূর্য্যরশ্মি, বায়ু ও শিশির হইতে নিত্য নূতন জীবনী-শক্তি গ্রহণ করাও তাহার পক্ষে তেমনই প্রয়োজনীয়। সেইরূপ যাহার অধ্যাত্ম জীবন আছে, সে ব্যক্তি একমাত্র শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কখনই থাকিতে পারে না।

কার্য্যতঃ সাধনের অন্য নাম অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য করিয়া, অভ্যাস দ্বারা ধর্ম্মভাব সাধন করিবার জন্যই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। কিন্তু সদুপদেশ এবং স্বাধীন চিন্তা উপেক্ষা করিয়া, কেবল সৎকার্য্যের জন্য সৎকার্য্য করিলে, অর্থাৎ সাধু কার্য্য করিলেই সদ্গতি হইবে, এইরূপ ভাবিয়া অনুষ্ঠান করিলে যে অভ্যাস জন্মে, তাহা জ্ঞান ও ভক্তিবিহীন অভ্যাস। ঐরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে, মানুষ অনেক সময়ে ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া, এবং অনেক সময়ে লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, উপলক্ষকেই সার ও সুখদ মনে করিয়া, অনুষ্ঠান করিতে পারে। এইরূপে কর্ম্ম-বন্ধনের সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রকে অনুচিত প্রাধান্য দিলে, যেমন জীবনের সজীবতা নষ্ট হইয়া মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, অনুষ্ঠানকে অনুচিত প্রাধান্য দান করিলেও, মানুষ কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, মানবাত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

সাধন-পথে গুরু বা উপদেষ্টার প্রয়োজন। উপদেষ্টা বা গুরু কাহাকে বলি? আমার গন্তব্য পথে আমা অপেক্ষা যিনি অধিক দূরে গমন করিয়াছেন, পথ চলিবার সুপরামর্শ আমাকে তিনি অবশ্যই দিতে পারেন। সেইরূপ সুপরামর্শ যাঁহার

নিকট পাওয়া যায়, তিনিই আমার গুরু। সাধন-পথে যে যত অগ্রসর হয়, তাহার দৃষ্টি তত উজ্জ্বল হইয়া থাকে। অল্প দৃষ্টিশালী মনুষ্যকে অধিক দৃষ্টিশালী মানুষ যেমন পথ দেখিবার সাহায্য করিতে পারে, প্রবীণ সাধকও নবীন সাধককে সেই-রূপে পথ দেখাইবার সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন পথিকদিগের অভিজ্ঞতারূপ শাস্ত্র অথবা নিজের স্বাধীন চিন্তা-রূপ দৃষ্টি শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল গুরূপদেশে চলিবার চেষ্টা করা যে পথের বন্ধুরতা বিস্মৃত হইয়া, চক্ষু থাকিতে চক্ষু মুদিয়া পরের হাত ধরিয়া চলিবার মত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মানবেতিহাসের লিখিত সত্য বা সিদ্ধান্ত এবং মানবের স্বাধান চিন্তা ও বিচারশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, মানুষ গুরুর অনুচিত আধিপত্য স্বীকার করিলে, অপদার্থ হইয়া যায় সন্দেহ নাই।

এইক্ষণ এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে,যদি সাধন-পথে শাস্ত্রবাক্য ও গুরুর উপদেশ পরস্পর বিরোধী হয়, সেরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? শাস্ত্রবাক্যই প্রতিপালন করা যাইবে,কি গুরুর উপদেশই শিরোধার্য্য করিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আপনার বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতর মনে হইবে, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। কেহ বা এরূপও মনে করিতে পারে যে, "শাস্ত্রকার ও উপদেষ্টা উভয়েই যখন আমা অপেক্ষা সাধন-পথে অধিক অগ্রসর এবং আমার বরণীয়, এরূপ অবস্থায়

আমার ক্ষুদ্রতর বিচারশক্তি উঁহাদিগের সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার উপরে ভাল-মন্দ বিচার করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে পারি না। ঐরূপ বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিতে যাওয়া অনুচিত, অথবা প্রয়োগ করিলেও, ভাল-মন্দ নির্ব্বাচন করা আমার পক্ষে অসাধ্য।" এই কথার কোনই মূল্য নাই। যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, মানবের বিচাবশক্তির প্রকৃতিই এইরূপ যে, পরস্পর বিরোধী বিষয় দূরে থাকুক, এক ভাবাপন্ন দুইটী বিষয় সম্মুখে পড়িলেও, তাহাদের মধ্যে ইতব বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া পারেনা। ভাল-মন্দ বিচার করিতে ভুল হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুইটী বস্তুর একটীকে আর একটী হইতে কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও, ভাল বা মন্দ মনে করিতেই হইবে।

এইরূপে বিচার করিয়া যাহা প্রশিষ্ট মনে হইবে, তাহাই অবলম্বন, অথবা তাহারই অনুগমন করিতে হইবে। এইরূপ না করিয়া মানুষের আর অন্য উপায় নাই। কোন কোন স্থলে, জীবনের কোন কোন অবস্থায় মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া, পরের মতে পরিচালিত হয় বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের মতের বিরুদ্ধ ঔষধাদি চিকিৎসকের মতানুসারে গ্রহণ করিয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলেও মানুষ আর এক রূপে আপনার বিচারশক্তিই প্রয়োগ করিয়া, তাহারই অনুসরণ করে। রোগী যদি জানে, চিকিৎসকের ঔষধ গ্রহণ করিলে তাহার গুরুতর অনিষ্ট বা জীবনের হানি নিশ্চয়ই হইবে, তাহা হইলে সে

চিকিৎসকের ঔষধ কদাপি গ্রহণ করে না। "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, চিকিৎসক এ বিষয়ে ভালরূপ জানেন; তাঁহার মতে চলিলে, আমার ভাল হওয়ার সম্ভাবনা; চলিয়া দেখি, ভাল হয়, তবে তাহার মতে চলিব, না হয় অন্যথাচরণ করিব;" এইরূপে বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিয়াই রুগ্নব্যক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। আপনার বিচার-শক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া কেহ কখনও জীবন পথে চলিতে পারে না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জ্যোতির্ব্বিদ যেমন অভ্রান্ত নহেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভিষক যেমন অভ্রান্ত নহেন, ধর্ম্মসাধনে ধর্ম্মোপদেষ্টা, বা গুরুও সেইরূপ অভ্রান্ত নহেন। অদ্য তাঁহার কোন উপদেশ মঙ্গলকর ও ভ্রমশূন্য হইতে পারে, কল্য যে তাঁহার কোন উপদেশ ভ্রমসঙ্কুল বা অমঙ্গলকর হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব সাধন-পথে গুরুর উপদেশই একমাত্র অবলম্বন বা সর্ব্বথা পালনীয় হইতে পারে না।

আপনার বিচার-শক্তিকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু আর একটী কথা মানুষের সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মার্থীর পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভাব থাকা আবশ্যক। গৃহের গবাক্ষ না খুলিলে যেমন গৃহমধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, বিনীত ও সরল শিক্ষার্থী না হইলেও, সেইরূপ ধর্ম্মোপদেষ্টার হৃদয়ের আলো শিষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা তর্কযুক্তি বা মীমাংসার উপরে অধিক নির্ভর করে না। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভক্তির উন্নত পথেই

প্রকৃত ধর্ম্মের আলো উন্নত জীবন হইতে শিক্ষার্থীর জীবনকে অনুশাসিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। ব্রহ্মডাঙ্গাতে যেমন জল দাঁড়ায়না, অবিনীত ও অহঙ্কৃত ধর্ম্মার্থীর জীবনেও সংদৃষ্টান্ত বা সদুপদেশ সেইরূপ কার্য্যকারী হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"বিদ্যা বিনয়ং দদাতি।" ফলতঃ যে বিষয়ে যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে, সে বিষয়ে তাহার প্রগল্‌ভতা থাকেনা, এবং শিক্ষক বা উপদেষ্টার নিকটে অবনতমস্তক থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

জীবনের আদর্শ।

ব্রহ্মোপাসককে যদি জিজ্ঞাসা করি, জীবনের আদর্শ কি? তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, "ব্রহ্মই মানবের জীবনের একমাত্র আদর্শ।" সত্য-সত্যই এক মাত্র ব্রহ্মই আমাদিগের জীবনের চরম আদর্শ। আমি যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, যাঁহার জ্ঞান-কৌশলে জীবিত, যাঁহার অনন্ত দয়াতে অনন্ত জীবনের অধিকারী, এবং যাঁহার পবিত্র আনন্দ-স্বরূপে ক্ষণমাত্র অবগাহন করিলে আমার স্বর্গরাজ্য লাভ হয়, সেই শিব, শুদ্ধ, অদ্বৈত ও সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ভিন্ন আমার পক্ষে আর কি আদর্শ হইতে পারে? আমি আর কাহার অনুসরণ করিব? আর কাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমার চিত্ত চিরকালের জন্য অভয় প্রাপ্ত ও অক্ষয় সম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে? হায়! যাহারা প্রমাদবশতঃ রক্তমাংস ও অপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্য বিশেষকে অথবা মনুষ্যরচিত গ্রন্থ বিশেষকে জীবনের আদর্শ বা নেতা বলিয়া প্রণিপাত করে, তাহারা কি হতভাগ্য!—তাহাদিগের অবস্থা কি শোচনীয়! ব্রহ্মোপাসক কি আর তাঁহার স্রষ্টা,

পাতা ও মুক্তিদাতা সেই অনন্ত, অপরাজিত ও অনির্ব্বেদ্য পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও অনুগমন করিতে পারেন ?

কিন্তু সামান্য মনুষ্যের পক্ষে সেই অনন্ত মহান্ পরমাত্মার অনুসরণ করিতে যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সহজ নহে বলিতেছি কেন ? যদি ইহা স্বাভাবিক না হইত, যদি বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিবার মানসে সদ্যোজাত মৃগশিশুর প্রথম-পদ-ক্ষেপের মত ইহা মানুষের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে এরূপ কথা মুখে আনিলেও গুরুতর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইত। কোথায় সেই দেবাদিদেব পরব্রহ্ম, আর কোথায় কীটস্য কীট মনুষ্য ! মনুষ্য, তুমি কিরূপে তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিবে ? কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবণসকল যেমন প্রকৃতি-বশতঃই মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, মানবাত্মা যখন কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসের বশ না থাকে, তখন সেইরূপ প্রকৃতি বশতঃই পরব্রহ্মের অনুগমন করে ! মানবহৃদয়ে বিধাতার এই অবি-নশ্বর অনুশাসন কার্য্য করিতেছে।

অনন্ত উন্নতিশীল মানবজীবন ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনন্ত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই পথ একদিকে যেমন সহজ, আর এক দিকে সেইরূপ দুরূহ। মনুষ্য-প্রকৃতি নিয়ত এই পথেরই অনুযাত্রী ; কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও দুর্ব্বলতা ইহাকে দুরূহ করিয়া ফেলে। এই পথের যাত্রীদিগের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থীদিগের জন্য অধ্যাত্ম রাজ্যে এবং জড় জগতে কতকগুলি উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল

চিন্তাশীল সাধক এই পথে অগ্রসর হন, তাঁহারাই এই সকল অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে, এবং এই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

এই পৃথিবী অসংখ্য জীবজন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, বড়ই বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিচিত্রতা একদিকে যেমন নিরতিশয় আনন্দ-জনক, অপর দিকে তেমনই অমূল্য উপদেশ প্রদান করে। অধ্যাত্মভাবে চক্ষু অনুরঞ্জিত হইলে দেখিতে পাই, যেন মানবাত্মার শিক্ষার জন্যই বিধাতা উহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা যদি কীট ও পতঙ্গ, এই উভয় জাতীয় প্রাণীর জীবনের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি, স্থূল দৃষ্টিতে আমাদিগের বোধ হয়; যেন কীটেরা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, গণনা-পরায়ণ ও সংসারাসক্ত। উহারা ভূতলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাতেই মলমূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাতেই সন্তানাদি উৎপাদন করে, এবং অহোরাত্র আহারীয় সংগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণকরে,এবং প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। উহাদিগের যেন স্ফূর্ত্তি নাই, আহারের-সংগ্রহ ভিন্ন কার্য্য নাই। বাস্তবিক উহাদিগের এরূপ অবস্থা নহে। আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের সৃষ্টির মধ্যে জীব নিরানন্দে জীবন যাপন করিতেছে, ইহা কি সম্ভব? ব্রহ্মের সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, প্রাণী মাত্রেরই হর্ষ-বিষাদের পরিমাণ আছে। তবে আমরা যাহা বলিতেছি,

তাহা কল্পনা মাত্র। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা উহাদিগের এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাই।

আবার পতঙ্গ-জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, উহারা যেন ঘোর বিলাসী, অস্থির-প্রতিজ্ঞ ও আমোদে উন্মত্ত। উহারা কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই জানে না। উহাদিগের কোন স্থির সঙ্কল্প নাই। প্রভাতে কি মধ্যাহ্নে সকল সময়েই, গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল ঋতুতেই, উহারা যথেচ্ছা উড়িয়া বেড়াইতেছে; কোন প্রকার গণনা নাই, জীবনের কোন দায়িত্ব বোধ নাই। প্রাতঃসূর্য্যের মৃদু কিরণে যখন অন্তরীক্ষ রমণীয় বেশ ধারণ করে, তখন উহারা বহির্গত হয়, আর অস্থির-প্রতিজ্ঞের মত একবার এখানে একবার ওখানে, কখনও বা সুখাভিলাষী বিলাসীর মত এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করে। এই দেখিলে পতঙ্গ তোমার সম্মুখস্থ নির্ম্মল আকাশে ক্রীড়া করিতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, পতঙ্গ কিছু লক্ষ্য করিয়া যায় নাই, সম্মুখে সুখদ যাহা পাইবে, তাহাই আশ্রয় করিবে।

সংসারেও আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। উহার কতকগুলি কীট-প্রকৃতি, আর কতক গুলি পতঙ্গ-বৃত্তি। কতকগুলি লোক কীটদিগের গর্ত্তখননের মত বিবাহাদি করিয়া, সন্তান-সন্ততিতে পরিবৃত হইয়া একটা সংসার রচনা করে, তন্মধ্যেই অবস্থিতি করে, তদ্ভিন্ন কিছু জানে না, এবং সর্ব্বদা তচ্চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। সমাজ অধঃপাতে যাউক,

তাহাতে তাহাদিগের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তাহাদিগের পুত্রকন্যা ভাল থাকিলেই হইল; প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ হউক, ক্ষতি নাই, তাহাদিগের ধনোপার্জ্জনে ত্রুটী না হইলেই হইল। কেননা তাহারা কীটপ্রকৃতি, কীটের মত সংকীর্ণমনা, কীটের মত গণনা-পরায়ণ। অর্থই তাহাদিগের অভীষ্ট দেবতা, এবং 'আমি ও আমার' কথাই তাহাদিগের ইষ্টমন্ত্র। হায়, আমাদিগের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কত হতভাগ্যই এইরূপে জীবন যাপন করিতেছে! কূপবাসী ভেক যেমন বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ ও অনন্ত আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার কি আনন্দ, তাহা স্বপ্নেও জানে না, উহাদিগেরও অবস্থা সেইরূপ শোচনীয়!

কতকগুলি লোক আবার ঠিক পতঙ্গবৃত্তি-বিশিষ্ট। তাহারা পতঙ্গের মত অস্থির; তাহাদিগের মনের দৃঢ়তা নাই, চরিত্রে বল নাই, তাহারা আপনার হৃদয়কে আপনি শাসন করিতে জানে না; যাহা অভিরুচি, তাহাই করে, যাহাতে তৃপ্তি জন্মিবে, তাহারই অন্বেষণ করে। তাহাদিগের জীবনের যেন কোন দায়িত্ব নাই। তাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্তর হইতে বিদায় দিয়া, কেবল 'কোথায় সুখ কোথায় সুখ' বলিয়া ইহার উহার পশ্চাদ্গমন করে। তাহারা গুরুজনকে অপরিচিতবৎ অশ্রদ্ধা করে, পশুদিগের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগকে অবহেলা করে, দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না, সামাজিক দায়িত্বের মর্য্যাদা কি, তাহা অনুভব করিতে পারে না; দিবারাত্র যৌবনে বার্দ্ধক্যে কেবল ইন্দ্রিয়-সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া

আপনাদিগকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। যাহা কিছু সুন্দর, তাহারা তাহাই অভিলাষ করে; ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুরুচি ও কুরুচির বিচার করে না; যাহা কিছু সুশ্রাব্য, তাহার দিকেই ধাবিত হয়, শ্লীলতা, অশ্লীলতা বা পাত্রাপাত্র বিচার করিতে অবসর পায় না; যাহা কিছু সুখদ বলিয়া কল্পনা করে, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করে, এবং এইরূপে কল্পতরু-ভ্রমে বিষবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া বিপদগ্রস্ত হয়। হায়, প্রতি মুহূর্ত্তে কত হতভাগ্য মনুষ্যই এইরূপে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হইতেছে! আমরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে পতঙ্গবৃত্তি বলি।

কীটপ্রকৃতি এবং পতঙ্গবৃত্তি, এই উভয়বিধ লোকই ব্রহ্মোপাসকের নিকটে নিন্দনীয়। ব্রহ্মোপাসক বিহঙ্গ-জীবনে অনেক সৌন্দর্য্য দেখিতে পান; বিহঙ্গদিগকে অনুকরণ করিয়া তিনি অনেক সময়ে উন্নত ও সুখী হইতে পারেন। বিহঙ্গ-জাতির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, উহারা যেমন কার্য্যশীল, তেমনই নির্লিপ্ত। রজনী প্রভাত হইবামাত্র, বিহঙ্গ জাগ্রত হইয়া কুলায় পরিত্যাগ করে, একবার শাখায় বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ-গান করে, তৎপরে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। উদর পূর্ণ হইলে, আবার নিবিড় পল্লবতলে বসিয়া বিশ্রাম অথবা সঙ্গীত করে। আর যখন পৃথিবীর কোন সামগ্রীতে, বৃক্ষলতা, ফলফুলে তাহার তৃপ্তি না হয়, তখন ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনন্ত আকাশের বক্ষে সন্তরণ করিতে থাকে, এবং অপার স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, অদৃশ্য স্থান হইতে

আনন্দধ্বনি করতঃ মানুষের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া, মানুষের হৃদয়ে আশা ও শান্তির উদ্রেক করিয়া থাকে। যদি বিহঙ্গভাষা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রাণের নিভৃত স্থল হইতে গগন-বিহারী বিহঙ্গ কি বলে, বলিতে পারিতাম। কিন্তু ঐরূপ বিহঙ্গরবে অনেক সময়ে অনন্ত পূর্ব্বস্মৃতি, অনন্ত আশার উদ্রেক হইয়া, চিত্তে ঘোর বিহ্বলতা জন্মিয়াছে।

বিহঙ্গ তাহার ভবিষ্যতের আহার সংগ্রহ করে না বলিয়া, কেহ মনে করিও না যে, উহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও পরিণামদৃষ্টি নাই। যখন ডিম্ব-প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কে না দেখিয়াছে, বিহঙ্গ কত যত্নে তৃণাদি আহরণ করিয়া কুলায় নির্ম্মাণ করে? ডিম্ব প্রসূত হইলে, বিহঙ্গ অনাহারে থাকিয়াও ডিম্বে তাপ দান করে। সন্তান প্রসূত হইলেই, বিহঙ্গ বহু যত্নে তাহার আহারাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লালন পালন করিয়া থাকে। বিহঙ্গ কার্য্যশীল, কিন্তু কেবল "আমিও আমার" লইয়া ব্যস্ত নয়। কেবল আপনার উদরপূর্ত্তি হইলে, অথবা সন্তানের লালন পালন হইলেই বিহঙ্গের কার্য্যের সমাপ্তি হয় না। বিহঙ্গ-জাতির সমাজ-বন্ধন অতি চমৎকার। বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, এবং বিপৎকালে একে অন্যের সহায়তা করিয়া থাকে। যখন কোন দুর্ব্বিনীত বালক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কুলায় হইতে শাবক অপহরণ করিতে যায়, তখন আত্মপর বিস্মৃত হইয়া কাননবাসী সমস্ত বিহঙ্গ তাহাকে আক্রমণ করে। যখন কোন বিহঙ্গ বিপদগ্রস্ত বা হত হয়, তখনই তজ্জাতীয় বিহঙ্গেরা প্রতি-

বিধানে সচেষ্ট হয়, অথবা আর্ত্ত স্বরে কোলাহল করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অনেক সময়ে আমাদিগের চক্ষু জলাভিষিক্ত হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে আমরা স্বার্থপর মনুষ্য-সমাজকে ধিক্কার করিয়াছি।

হে ব্রহ্মোপাসক, কীটের মত সাংসারিক হইও না, অথবা পতঙ্গের মত বিলাসী হইও না; কিন্তু বিহঙ্গের মত কার্য্যশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ অথচ নির্লিপ্ত ও সুখী হও। হায়, আমরা যদি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পরব্রহ্মের স্মরণ, মনন ও গুণগান করিয়া সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতাম, আমরা যদি পিতামাতা ও পুত্রকলত্রাদির সমুচিত শুশ্রূষা করিতে পারিতাম, এবং আমরা যদি কেবল তাহাতেই তৃপ্ত না থাকিয়া সমাজের সুখদুঃখে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম, আমরা যদি সমুচিত পরিশ্রম করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পারিতাম, আর যখন বিষয়কার্য্য ভাল না লাগিত, পার্থিব কিছুতেই তৃপ্তি না হইত, আমরা যদি তখন অনন্তঃরাজ্যে উড়িয়া যাইয়া অদৃশ্য হইতে পারিতাম, এবং নব নব ভাবে বিমোহিত হইয়া স্ফূর্ত্তি ও নবজীবন লাভ করতঃ আনন্দধ্বনি করিতে পারিতাম, এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে জগত পবিত্র করিতে পারিতাম! হায়, আমরা কি এইরূপ করিতে পারিব? হে আত্মন্, নিরাশ হইও না; যখন ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই পারিবে। হে ব্রহ্মোপাসক! আশ্বস্ত হও, একদিন এইরূপে তোমার জীবন ধন্য হইবে।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, সংসার ও অধ্যাত্মজগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অতি সুন্দররূপে চিত্র করিয়াছেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি লংফেলো (Long fellow) তদীয় কোন কবিতার এক স্থলে বলিয়াছেন ;—

"Not to suffer, nor to enjoy,
Is our life's destined end or way ;
But to act, act as each to-mrrow
May find us wiser than to-day"

"আমরা কেবল দুঃখভোগ করিবার জন্য, অথবা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই ; ইহার কোনটাই আমাদিগের নিয়তি নহে। কিন্তু আমরা কেবল কার্য্য করিব, এবং খাটিয়া খাটিয়া দিন দিন অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ও উন্নত হইতে থাকিব।"

এই কবিতাটীতে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে না হইলেও, অতি সুন্দর রূপে মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। সত্য সত্যই আমরা কেবল দুঃখ-বিড়ম্বনায় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে আসি নাই ; পক্ষান্তরে কেবল ভোগবিলাস ও আমোদ-প্রমোদে ভাসিয়া বেড়াইব, ইহাও আমাদিগের জীবনের নিয়তি নহে। রোমানকাথলিক পুরাতন যাজকদিগের মত রক্তমাংসকে পীড়ন করিয়া, অথবা চার্ব্বাক কিংবা ইপিকিউরাসের শিষ্যদিগের মত পানভোজন ও আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিয়া, মানব জীবন সার্থক বা চরিতার্থ হইতে পারে না। এই উভয় পদ্ধতি অস্বা-

ভাবিক, সুতরাং অমঙ্গলের নিদান। যাহারা সংসার-সম্ভোগ, ও শারীরিক সুখকে শয়তানের পূজা মনে করিয়া, নিয়ত আত্ম-নিগ্রহে দিন যাপন করে, তাহারা কি হতভাগ্য! যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শরীর কণ্টকিত হয়, আজিও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন তীর্থস্থান সমূহে সেরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উহারা অস্বাভাবিক সাধন অবলম্বন করিয়া, অঙ্গ বিশেষকে ছেদন বা প্রিয়পাত্রকে বিসর্জ্জন করিয়া, শান্তিস্বরূপ ধর্ম্মকেঘোরতর রাক্ষসের বেশ প্রদান করিতেছে, ধর্ম্মরূপ পরম তৃপ্তিকর পদার্থকে প্রকৃতি ও মনুষ্য স্বভাবের চিরশত্রু ও বিরোধীরূপে প্রদর্শন করিয়া লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে!

সেইরূপ আবার দেখ, নগরে নগরে শিক্ষিত অশিক্ষিত কত লোক কেবল ভোগসুখের জন্য লালায়িত হইয়া কত পাপাচরণ করিতেছে। উহারা কেবল অর্থ, কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ, কেবল অভিলাষ লইয়া অহরহ পামর স্বভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। এই সকল লোকের অবস্থা কি অধিক-তর শোচনীয় নয়? নিদ্রোত্থিত মৃগশিশু যেমন আপনাকে ব্যাধ-নিগড়ে আবদ্ধ দেখিয়া হতবুদ্ধি হয়, হায়! চৈতন্যলাভ হইলে, তেমনই এক দিন উহারাও আপনাদিগকে দুর্ভেদ্য পাপপাশে আবদ্ধ দেখিয়া 'হা হতোস্মি' বলিয়া রোদন করিবে।

কবি কহিয়াছেন, কেবল কার্য্য করিব, কেবল খাটিব, ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। কেহ মনে করিও না যে, কেবল শারীরিক পরিশ্রমে সংসারের উন্নতি করা, পরিজন

প্রতিপালন করা, অথবা দুঃখীকে দান ও বিপন্নকে বিপদুদ্ধারাদি করা এই "কার্য্য করার" অর্থ। মানব-হৃদয়দর্শী কবি-শ্রেষ্ঠ এরূপ একদেশদর্শীর মত কথা কহিবেন কিরূপে? কার্য্য করার অর্থ সমগ্র মানব প্রকৃতিকে পরিচালিত করা। ব্রহ্মোপাসকের নিকটে একথা অধিক বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, শরীর, মন ও হৃদয় এই তিনের যুগপৎ পরিচালনাই এই "কার্য্য করার" অর্থ। মহামারি-সময়ে যে চিকিৎসক অনাহারে ও অনি-দ্রায় নগরবাসীদিগের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়া ঔষধ, পথ্য বিতরণ করেন, তিনি যেমন কার্য্য করেন; সেইরূপ যে দার্শ-নিক নিশীথ সময়ে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করেন, এবং আপনার চিন্তালব্ধ সত্য সকল জগতে প্রচার করিয়া সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করেন, তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করেন; আবার যে ভগবদ্ভক্ত সাধু, ধ্যান বা প্রার্থনা করিতে বসিয়া ভক্তিবিগলিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন, আর আপ-নার জীবনের পুণ্যের প্রভাব ও পারলৌকিক আশার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মানব-সমাজকে মোহকোলাহল ও ভয়ভাবনা হইতে আশ্বস্ত করেন, তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করেন। এ সকলই কার্য্য, কেননা এ সকলই মানব-প্রকৃতির পরিচালনা। শক্তি ও অবস্থা বিশেষে ন্যূনাধিক-রূপে আমাদিগকেও এই সকল কার্য্যই করিতে হইবে। নচেৎ ঐ দরিদ্র কর্ম্মকার-পুত্র যে কেবল অহোরাত্র অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া

লৌহ-পীড়নই করিবে, আর তুমি ধনী সন্তান, গৃহে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কাব্যালোচনা বা হাস্যালাপই করিবে, ঈশ্বরের এরূপ বিধি নহে। তোমার শরীর, মন ও হৃদয় আছে; উহারও শরীর, মন এবং হৃদয় আছে। উহার মস্তিক, উহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে চিরনিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া, শরীরের রক্ত জল করিয়া উহাকে সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে, আর তুমি কেবল বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিবে, অপরে আসিয়া তোমার আলস্যরোগগ্রস্ত দেহ, তোমার অচল হস্তপদ মর্দ্দন করিয়া দিয়া, তোমার অঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন করিয়া দিবে, এবং তোমাকে জীবন-পথে সুখী রাখিবে, ইহা ন্যায়বান পরমেশ্বরের ব্যবস্থার একান্তই বিরোধী।

হে ব্রহ্মোপাসক, কার্য্য কর। শরীর, মন ও হৃদয় খাটাইয়া, তোমার সমগ্র স্বভাবকে পরিচালিত করিয়া, দিন দিন উন্নত ও সুখী হও। কবি কহিয়াছেন, তাহা হইলেই তুমি প্রতিদিন অধিক তর জ্ঞান-সম্পন্ন হইবে; কেবল জ্ঞান সম্পন্ন নয়, সুস্থ, সুখী, জ্ঞানী ও প্রেমিক হইয়া তুমি ধন্য হইবে, পৃথিবীকে ধন্য করিবে। ব্রহ্মসঙ্গীত-পুস্তকে একটী গীত আছে, তাহাতে মনুষ্য-জীবনের আদর্শ অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। সেই গীতটী এই,—

"তার কি দুঃখ বল সংসারে,
যে জন সত্যকে আশ্রয় করে;
করে কাল যাপন, হয়ে হৃষ্টমন,
দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে?

নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়-দমন,
পর-উপকার, বৈরাগ্য-সাধন,
হইয়াছে যার, জীবনের সার,
সে যায় অনায়াসে ভবপারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণপণে করে কর্ত্তব্য-পালন;
অটল প্রভু-ভক্তি, সরল শান্ত-মতি,
প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্ব নরে।"

এই গীতে ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য অতি পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্য সত্যই যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে, ভ্রম ও কুসংস্কার-বশতঃ কল্পিত দেবতার উপাসক না হয়, মনুষ্যের ভাবুকতা-রচিত মনুষ্য-স্বভাব-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র, ক্রোধন-স্বভাব অথবা প্রতিযোগিতা-পরায়ণ দেবতাকে আত্মোৎসর্গ না করে, পুস্তকবর্ণিত অথবা লোক-মুখে শ্রুত কোন মৃত দেবতার শিষ্য হইয়া, আপনাকে জড় পদার্থ না করে, যে ব্যক্তি আপনার আত্মাতে প্রকাশিত সত্যস্বরূপ অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পূজা করে, তদ্ভিন্ন ভয় বা ভাবুকতাবশতঃ অথবা কোন লোকের বা সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া অনুচিত অনুষ্ঠানে লিপ্ত না হয়, সেই ধন্য, সংসারে তাহার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে বিবিধ প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইলেও, সে ব্যক্তি যথার্থ আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ করিয়া, নিয়ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও আপনার আনন্দে আনন্দিত থাকে।

যিনি ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকেন, তিনিই কেবল কর্ত্তব্যপালন-জনিত সুখ ও উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, কেবল বিধি-ব্যবস্থা করিয়া কর্ত্তব্য-সাধন করে, কাহার সাধ্য? যখন প্রিয় বন্ধু ঘোরতর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে, তাহার সহায় হইয়া কে তাহার শুশ্রূষা করিতে পারে? যখন দস্যু হস্তে পতিত সতী অথবা নির্দ্দোষী শিশুকে রক্ষা কবিতে হয়, তখন ঈশ্বরের প্রেমে অনুপ্রাণিত না হইলে, ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইলে, অপবিত্রতা দলন করিয়া, পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রাণদানে উদ্যত হইতে কে পারে? যখন পূর্ব্ব পুরুষের উপার্জ্জিত প্রচুর সম্পত্তি হইতে একটী সত্য কথার অনুরোধে বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয়, ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইলে, সত্য ও ন্যায়ের পূজা কবিত না শিখিলে, তখন কোন্ ব্যক্তি সে অবস্থায় মিথ্যা কথা না কহিয়া পারে? বাস্তবিক উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অনুজ্ঞাপত্র হারাইলে, সামান্য পদাতি যেমন হতাশ্বাস হইয়া পড়ে, ঈশ্বরানুপ্রাণনা ভিন্ন ক্ষুদ্র মনুষ্যেরও সেই দশা ঘটে। হে ধর্ম্মকর্ম্মহীন শিক্ষাভিমানী বন্ধু! তুমি আত্মবলে সমাজে সুচরিত্র ও প্রতিষ্ঠাভাজন থাকিয়া যাইতে পার, মনে করিওনা। যখন প্রলোভনের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিবে, তখন তোমার কল্পিত বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঈশ্বর করুন, তোমাকে সেই অতর্কিত অবস্থায় পড়িতে না হয়।

কিন্তু তুমি এখন হইতেই সাবধান হও, চরিত্র অক্ষয় ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত করিতে যত্ন কর। প্রত্যুত যাহারা অভিমান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া, শান্ত ও সরল হইয়া, পরমেশ্বরকে প্রভু মনে করিয়া, অটল ভক্তিভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহারাই সংসারে মানুষের মত জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারে।

সঙ্গীত বলিতেছে, উপাসনা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়। বস্তুতঃ উপাসনা ভিন্ন জিতেন্দ্রিয় থাকা যায় না। যাঁহারা সাধন পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সংসারে ভোগ-বিলাসের বস্তু এত অধিক, এবং নিত্য নূতন নূতন ভাবে এতই আসিয়া মানুষের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়, আর দুর্ব্বল মনুষ্যকে এত অসাবধান অবস্থায়ই সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খলতায় মানুষের লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হইবার পদে পদে সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা ব্রহ্মোপাসক; আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, আমরা দেখিয়াছি, যে সময়ে জীবনে উপাসনার শিথিলতা ঘটিয়াছে, তখনই চরিত্রে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কার্য্যতঃ কেহ কিছু অন্যায় না করিলেই যে সুচরিত্র রহিল, তাহা নহে; চরিত্রের বিকার অন্তরে ঘটে, অবস্থা ও সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহা কার্য্যে পরিণত হয়, কুষ্মাণ্ডের অভ্যন্তর-ভাগ অদৃশ্যরূপেই নষ্ট হইয়া যায়; ভূতলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলেই, লোকে তাহা দেখিতে পায়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া সুস্থ থাকিতে হইলে, যেমন প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

নিবারক ঔষধ খাইতে হয়, সেইরূপ দুর্ব্বলতা ও পাপ প্রলোভন-পূর্ণ জনসমাজে অবস্থিতি করিয়া, চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও, ভগবদুপাসনা দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ করিয়া লইতে হয়।

কেবল ইহাই নহে। কর্ষিত ভূমিখণ্ডে সুশস্য জন্মিয়া, সেই শস্যের মূল দ্বারা মৃত্তিকা সমাচ্ছন্ন হইলেই, যেমন আর তাহাতে সহজে জঙ্গল জন্মিতে পারে না, ভগবদুপাসনা দ্বারা অন্তর-ক্ষেত্র সৎ ও সাধুভাব দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিলে, সাধুভাব ক্রমে অন্তরে বদ্ধমূল ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেই ক্রমে ইন্দ্রিয়দিগেরও অত্যাচার তিরোহিত হইয়া যায়। সাধকেরা বলিয়াছেন,—"সাধুভাব দ্বারা অসাধুভাব পরাজিত কর।" এ কথার তাৎপর্য্য এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যের অসাধুভাব বা অসৎকার্য্য যেমন নিজের সাধুভাব ও সৎকার্য্য দ্বারা পরাস্ত করা যায়, আপনার অন্তরেও সাধুভাব পোষণ করিয়া অসাধুভাব পরাজিত করিতে হয়। এই পথ ভিন্ন বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিবার আর উপায় নাই। ঔষধ ভক্ষণ, অঙ্গচ্ছেদন অথবা অন্য কোন প্রকারের শারীরিক নিগ্রহে উহা হইবার নহে।

সঙ্গীত আরও বলিতেছে, ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে পরোপকারে আত্মসমর্পণ করা চাই। এই পরোপকার-সাধনই প্রকৃত বৈরাগ্য-সাধন। নচেৎ স্বপাক-ভক্ষণ, সংসার-ত্যাগ, অথবা নির্লজ্জ নগ্নতা ইত্যাদি বৈরাগ্যসাধন নহে। বস্তুতঃ অনুরাগেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি। যখন সাধক ঈশ্বর-প্রেমে ও ভ্রাতৃভাবে উন্মত্ত হয়েন, যখন নরনারীর সেবা করিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মে, তখনই ভোগ-

বিলাস ও অসার আমোদ প্রমোদে তাঁহার উপেক্ষা ও বিরাগ জন্মে। তখন তাঁহার হৃদয় সমাজের জন্য কাতর হয়; কিরূপে সমাজে ধর্ম্ম ও পুণ্য জয় লাভ করিবে, তজ্জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মে। তখন আর তিনি ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে, ইতর আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইতে, অথবা "আমিও আমার" এই নীচ ভাব লইয়া সংসারে কীটের মত হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহারই নাম বৈরাগ্য, বৈরাগ্য আর কিছুই নহে। অনুরাগ-সাধন হইলে বৈরাগ্যসাধন হয়। তাহাতেই সাধক বলিয়াছেন,—

"পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনম্ কোঽপি লভেৎ
তস্য-তুচ্ছম্ সকলম্।"

ইহাই প্রকৃত সত্য কথা। শত শত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি, একবার স্বর্গীয় প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতি ও নরনারীর প্রতি ভ্রাতৃভাব লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ভূতলে আর সামান্য বিষয়ে সাধকের উপেক্ষা জন্মে। তুমি আমি সংসারে যেরূপ মধ্যে মধ্যে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই, গৃহসুখ-লালসায় লালায়িত হই, শত শত লোক প্রতিনিয়ত যেরূপ ইতর আমোদ ও নীচ সুখের জন্য ধাবিত; অনুরাগী সাধক সেরূপ নহেন। যে কোন উন্নতি বা আনন্দে তিনি স্বয়ং উন্নত ও সুখী হইবেন, যাহাতে সমাজের সুখ বর্দ্ধিত হইবে, পাপ কুরুচি, অশান্তি ও অজ্ঞান হইতে সমাজ উদ্ধার পাইবে, তাহার দিকেই তাঁহার চিত্ত স্বতঃ ধাবিত হয়। চুম্বক দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া, লৌহ যেমন চুম্বকের ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, ঈশ্বর-প্রেমে অনু-

রঞ্জিত হইয়া তাঁহারও সেই দশাই হয়। ভক্তি ও প্রেমের পবিত্র প্রভাবে যাঁহার চিত্ত দৈবভাবাপন্ন হইয়াছে, যিনি পশুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই উন্নত লোকে অবস্থিতি করিয়া পৃথিবীতে ভূমানন্দ লাভ করিতেছেন; তাঁহারই জীবন প্রকৃত আদর্শপথে পরিচালিত হইয়া ধন্য ও সার্থক হইয়াছে।

ভারতে পৌত্তলিকতা।

বর্ত্তমান ও ভূত কালের ইতিহাস পাঠ করিলে, প্রায় সমস্ত দেশেই ত্রিবিধ পৌত্তলিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতা, (Fetichism) বৈদিক পৌত্তলিকতা বা প্রকৃতি-পূজা, (Worship of Nature) এবং পৌরাণিক পৌত্তলিকতা বা পুত্তল-পূজা (Idolatry)

প্রস্তর, বৃক্ষ ও সরীসৃপাদির পূজাকে আদিম, অসভ্য বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতা বলে। প্রশান্ত ও দক্ষিণ মহাসমুদ্রস্থ দ্বীপবাসী অসভ্য লোক, আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতি, এবং ভারতের অধিকাংশ আদিম নিবাসির মধ্যে অদ্যাপি এই আদিম পৌত্তলিকতাই প্রচলিত রহিয়াছে। জনসমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ পৌত্তলিকতাই স্বাভাবিক। যে সময়ে মানুষ প্রায় পশুর অবস্থায় থাকে, নগ্নদেহে ফলমূল বা আম মাংস ভক্ষণ করিয়া ভূগর্ভে বা তৃণকুটীরে জীবন ধারণ করে, তখন মানুষের অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই থাকে, এবং চিন্তাশক্তিও অপরিস্ফুটই থাকিয়া যায়। সে সময়ে মানুষ ভয়, বিদ্বেষ ও

পাশব ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন ভাবই প্রায় উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং আপনার চারি দিকে জগতের যে সকল পদার্থ দেখিতে পায়, মানুষ তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষুধা—ভক্তির অযাচিত ও অস্ফুট অনুশাসন প্রতি মানবাত্মায় নিহিত; তাই অসভ্য অবস্থায়ও মানব জড় পদার্থের মধ্যে যাহার কিছু বিশেষ গুণ ও শক্তি দেখিতে পায়, তাহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া, তাহারই পূজা করে। পূজা করে বলিলে ঠিক হয় না,—তাঁহাকেই ভয় করে, এবং সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করে।

জন-সমাজের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ উন্নত হইতে থাকে। সুতরাং তখন জড় পদার্থ সকলের পূজার স্থানে ক্রমে জড় প্রকৃতির পূজা আরম্ভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পূজা পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জড়ের উৎপাদক ও পরিচালক এক অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া, উঁহারই পূজা করিতে থাকে। তখন শীতল-সলিলা স্রোতস্বতী, তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র এবং শস্যোৎপাদক মৃদু-বর্ষণকারী মেঘের স্বতন্ত্র পূজা না হইয়া, জলের অধিষ্ঠাত্রী বরুণের কল্পনা হয়, এবং তাহারই পূজা হইয়া থাকে। এইরূপে দাবাগ্নি, বাড়বাগ্নি ও বজ্রাগ্নির স্বতন্ত্র পূজা লুপ্ত হইয়া, এক অগ্নিরই পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। জনসমাজের সভ্যতার ক্রমের সঙ্গে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইলে, মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জড়কে জড়প্রকৃতির এক এক অঙ্গ

বলিয়া বুঝিতে পারে। জ্ঞানের অভাবে, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র জড়কেই ঈশ্বর মনে করিত। জ্ঞান কথঞ্চিৎ উন্নত হইলে, তাহা না করিয়া, জড় প্রকৃতির ঐ অঙ্গ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া থাকে। স্থূল জড় পরিত্যাগ করিয়া, এইটুক সূক্ষ্মত্বে গমন করিয়া থাকে। কেবল যে মানুষের জ্ঞানের উন্নতিতেই এরূপ হয়, তাহা নহে। মানুষের হৃদয় অর্থাৎ অন্তরের ভাবও প্রশস্ত হইয়া পড়ে; এইজন্য আর ক্ষুদ্র জড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঈশ্বর লইয়াও মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সেই সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনা প্রভৃতিও উন্নত এবং কিয়ৎ পরিমাণে আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে। (১) প্রকৃতিপূজার ইহাই কারণ।

এই অবস্থার পরেই মানুষের একেশ্বরবাদী হইবার—প্রকৃত তত্ত্বে উপস্থিত হইবার কথা। কেননা, জড় জগতের প্রতি বিভাগে, জড়-সৃষ্টির প্রতি অঙ্গে, এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনার পর, মানবের জ্ঞান আরও কিছু উন্নত হইলে, মানুষ অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, জড় প্রকৃতির একই অধিষ্ঠাত্রী—জড় সৃষ্টির একই প্রাণ। কিন্তু জগতে এরূপ ঘটে নাই; মানুষ প্রকৃতির পূজা পরিত্যাগ করিলেই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারে নাই। প্রকৃতি-পূজার পর সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের জগৎময় কর্ত্তৃত্বের ভাব সকল সমাজমধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর এক আপদ আসিয়া

(১) ঋগ্বেদের প্রার্থনা সকল এ কথায় সুন্দর পরিচয় স্থল।

মানুষের ধর্ম্মোন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া, ঐ ভাবের সমুচিত উন্নতি ও প্রচার হইতে দেয় নাই। সে আপদ পৌরাণিক পৌত্তলিকতা।

বৈদিক পৌত্তলিকতা হইতে যে পৌরাণিক পৌত্তলিকতা হীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ পৌরাণিক পৌত্তলিকতায় বহু ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে, ঈশ্বরের মহান্ ভাবের অনেক খর্ব্বতা হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম জটিল হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পৌরাণিক পৌত্তলিকতায় ধর্ম্মের সরল সৌন্দর্য্যের ও মহত্বের অনেক হ্রাস হইয়াছে। জনসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির স্থলে এরূপ অবনতি কেন হইল?

অন্যান্য স্থানে পৌরাণিক পৌত্তলিকতার কেন সৃষ্টি হইল, তাহার উত্তর দিতে পারি না। ভারতবর্ষে কেন হইল, তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। পৌরাণিক পৌত্তলিকতার প্রধান কারণ নরপূজা। (২) মানুষ বহুকাল অচেতন জড়ের পূজা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিল না। সূক্ষ্ম কল্পনা-প্রিয় হইয়া, এবং কেবল জ্ঞান-লব্ধ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া, ভক্তির আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, বিশেষ ক্ষমতাশালী মনুষ্যকে দেবাবতার বা দেবাংশ বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। সকল দেশেই এইরূপ দেবাংশ মনুষ্যদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, যম ও সূর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত

(২) Hero-worship বলিলে এই নরপূজার প্রকৃত অর্থ করা হয়।

করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের (Mythology) সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাতন দুই সভ্যজাতি হিন্দু ও গ্রীকদিগের প্রায় সমস্ত পুরাণের এইরূপে উৎপত্তি।

ভারতবর্ষে প্রকৃতি পূজা যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মীশর, গ্রীশ বা অন্য কোন প্রাচীন সভ্য দেশে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল দেশেই আদিম বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতার পরেই একযোগে প্রকৃতি-পূজা ও পুত্তলপূজা দেখিতে পাওয়া যায়। মীশর দেশে সভ্যতার সময়েও লোকে কুম্ভীর, পলাণ্ডু, আইসিস নামক বাস্তুদেবতা ও সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিত। অদ্যাপি ভারতবর্ষে লোকে সর্প, গঙ্গা, তুলসী ও অসংখ্য পুত্তলের পূজা করে। ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতা ত্রিবিধ পৌত্তলিকতারই মিশ্রণ মাত্র। যে ব্যক্তি শালগ্রাম ও সর্পের পূজা করে, সেই "জবা-কুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্যকে প্রণিপাত করিতেছে, আবার সেই কালী ও কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাদিগের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতেছে। ভারতে বর্ত্তমানে পৌত্তলিকতার তিন মূর্ত্তিই বিরাজিত। কিন্তু পুরাতন কালে গমন কর, এমন একদিন ছিল, যখন ভারতীয় আর্য্যগণ একমাত্র প্রকৃতি-পূজক ছিলেন, বৃক্ষ, লতা বা প্রতিমাপূজা করিতেন না। সেই প্রকৃতি-পূজার মন্ত্র, প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান সংগৃহীত হইয়া, জগতের আদি গ্রন্থ বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদের পরে ভারতে এরূপ অবনতি কেন হইল? বেদের লিখিত প্রকৃতি-পূজার লোপ হইয়া, ভারতীয় আর্য্যসমাজে কেন

আবার জড় ও পুত্তল-পূজার প্রাদুর্ভাব হইল? এ অতি দুরূহ প্রশ্ন। এরূপ হইবার তিনটী কারণ আমরা স্থির করি। (১) সাধারণ শিক্ষার অভাব, (২) জাতিভেদ এবং (৩) বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিযোগিতা।

বেদ-বিহিত প্রকৃতিপূজা বহু দোষযুক্ত, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মভাবের উচ্চতা ও সরলতা হেতু তৎকালে প্রশংসনীয়। বেদের পর বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদের সময়ে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক মার্জিত ও উন্নত হইয়াছিল। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদও স্বীকৃত হইয়াছিল। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্য তৎকালেই ভারতক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়াছিল। আবার কেন নিকৃষ্টতর পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইল? ইহার প্রধান কারণ, সাধারণ শিক্ষার অভাব, ও জাতিভেদ। ভারতবর্ষে জাতি-সাধারণ জ্ঞান ও বিশ্বাসে উন্নত হইয়াছিল না। অজ্ঞান সমাজে উন্নত ধর্ম্মমত স্থান পায় না, পাইলেও তাহার উচ্চতা রক্ষা হয় না। ফিজি দ্বীপের অধিবাসীরা সর্পের পূজক ছিল; সুতরাং উপাস্য দেবতাকে খুব ভয় করাই তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল। যখন ঐ স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়, তখন ঐ দ্বীপবাসীরা ভজনালয়ে উপাসনা-কালে আর্ত্তনাদ করিত! খ্রীষ্টীয় প্রচারকেরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহারা উপাস্য দেবতার ভয়েই ঐরূপ করিয়া থাকে। উহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের মত গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ উহার উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ভারতে

অতি অল্প সংখ্যক লোক জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন, অপর সাধারণ লোক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং সাধারণ লোকসমাজ মূর্খ জড়োপাসকই থাকিল।

যে অল্প সংখ্যক লোক জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও আপনাদিগের মত ও বিশ্বাসের উচ্চতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ,—জাতিভেদ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে, ভারত-সমাজে প্রচারের ভাব কস্মিন কালেও ছিল না। যদি প্রচারের ভাব প্রবল থাকে, তাহা হইলে নিতান্ত বর্ব্বর সমাজেও অল্প কতক লোক আপনাদিগের উচ্চ মত ও বিশ্বাস লইয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। কেননা, প্রচারের ভাব প্রবল থাকাতে, বাহিরের কুদৃষ্টান্ত ও মূর্খতায় তাহাদিগের তত অপচয় করিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহাদিগের উন্নত মত ও বিশ্বাস ক্রমে প্রচারিত হইয়া, জনসমাজে ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ভারত-সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীজাতি, এবং অবশিষ্টদিগের নয় দশমাংশ শূদ্রদিগের বেদ-বেদান্তের আলোচনায় প্রায় অধিকার ছিল না। ভুলেই করুন, আর দুরভিসন্ধিতেই করুন, সমাজের পরিচালকেরা নিষ্ঠুর জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন?—না, সমাজের ষোড়শ ভাগের পঞ্চদশ ভাগ লোককে জ্ঞান-ধর্ম্মের অনুশীলনে বঞ্চিত রাখিলেন। ষোল জনের মধ্যে একজন জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা করিতে পারিল। সেও আবার জাতিভেদের খাতিরে, আপনার ভাক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, অপর সকলকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য

নানা কৌশল ও কুটিল পথ অবলম্বন করিল। ইহার ফল কি হই-য়াছে? না, অবশেষে মাকড়সা আপনার জালে জড়িত হইয়া পড়ি-য়াছে! ঐ দেখ, যে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-পুরুষ "সত্যং শিবমদ্বৈতং" বলিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়াছে, সেই আজ মৃত্তিকা দ্বারা কুৎসিত মূর্ত্তি গড়াইয়া, পশু-পূজায় পরিতৃপ্ত হইতেছে! তোমার কি সাধ্য, তাহাকে সহজে ঐ পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার কর?

ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতার অপর কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিযোগিতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতা ত্রিবিধ পৌত্তলিকতারই মিশ্রণ। উহাতে যেমন শালগ্রাম ও সর্পের পূজা আছে, তেমনই অগ্নি ও বরুণের পূজা আছে, আবার তেমনই কৃষ্ণ, কালী ও অন্যান্য অসংখ্য পৌরাণিক দেবতারও পূজা আছে। সাধারণ শিক্ষার অভাবে ও জাতিভেদের প্রভাবে, আর্য্যগণ উচ্চতর প্রকৃতি পূজা হইতে সম্যক না হউক, অনেক দূর চ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পুনরায় জড়োপাসনা কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তারপর কল্পনা-প্রিয়তা ও নর-পূজায় পুরাণের যে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসান-কালে, তাহার বিপুল বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষকে "তেত্রিশ কোটি দেবতার" ক্রীড়া-ভূমি করিয়াছিল। হায়, যে ভারতের লোকসংখ্যা তখন পঞ্চ কোটিও ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, সেই ভারতে পূজা ও নৈবেদ্যের ভিখারী দেবতা তেত্রিশ কোটি! ভারতে অভাবনীয়

ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ ঘটিল ! অনাহারে ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি হাহা-কার করিতে করিতে মরিয়া গেল !!

বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান-কালে ভারতে পুরাণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কেন ?—আর হইয়াছিল যে, তাহারইবা প্রমাণ কি ? কেন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বহু শতাব্দী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতে একাধিপত্য করিয়া, ঘোরতর স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিল; অসার আড়ম্বর এবং অশ্লীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থলবর্ত্তী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অত্যা-চারে ও ব্রাহ্মণের একাধিপত্যে আর্য্যাবর্ত্ত নিপীড়িত হইয়াই যেন আর্ত্তনাদ করিতেছিল ! ঐতিহাসিকেরা জানেন, সেই আর্ত্তনাদেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্ম। অসার আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান বিলোপ করিয়া, ধর্ম্মকে জ্ঞানময় ও অধ্যাত্ম করা, এবং ব্রাহ্মণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিনাশ করিয়া, সমাজে সাম্য স্থাপন করাই বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম সাধন করিয়াছিল। কিন্তু সেই সাম্য ও সেই ধর্ম্মজ্ঞান চিরস্থায়ী হইল না। সহস্র বৎসর আধিপত্য করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন হইতে লাগিল। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের আলোচনা করিয়া, ভক্তি ও অনুষ্ঠান হইতে ক্রমেই দূরবর্ত্তী হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মের "ধর্ম্মত্ব" লোপ পাইল, উহা নাস্তিকতাতে পরিণত হইল। নাস্তিকতা দুই চারি ব্যক্তির জীবন দুঃখময় করিতে পারে বটে, কিন্তু লোকসমাজে তিষ্ঠিতে পারে না। কেননা, মানব সমাজ—মানব হৃদয় মনের সমষ্টি, ধর্ম্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্ম

লোকসমাজ হইতে পলায়ন করিয়া, জঙ্গলে ও মঠে আশ্রয় লইল।

ব্রাহ্মণেরাও সুযোগ পাইল। অপহরণকারী দুর্ব্বল বা স্থানান্তরিত হইলে, হৃত সম্পত্তিকের সন্তানেরা যেমন সুযোগ পায়, লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণেরাও তেমনই সুযোগ পাইল। তাহারা তাহাদিগের ধর্ম্মমত ও প্রাধান্য প্রচার করিতে লাগিল। সেই প্রচারের উপায় পুরাণ-রচনা। কতকগুলি পুরাণের উপাখ্যান তত ভাল নয়। কিন্তু অধিকাংশ পুরাণের উপাখ্যান অতি সুন্দর, উহাতে মনোহর কল্পনা আছে। ভারতের সাধারণ সমাজ নীরস জ্ঞানালোচনা ও নাস্তিকতা হইতে রক্ষা পাইয়া, আগ্রহের সহিত পৌরাণিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা শত কল্পনা যোজনা করিয়া, জনসাধারণের সেই ধর্ম্মের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে লাগিল। জনসাধারণকে বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোককে, সমাজের অধিকাংশ লোক অর্থাৎ শূদ্রদিগকে আয়ত্ত করিবার আর এক কৌশল ব্রাহ্মণগণ অবলম্বন করিল। তাহারা শূদ্রাদির পূর্ব্ব-পূজিত অনেক অনার্য্য দেবতাকেও আর্য্যধর্ম্মে স্থান দিল। এইরূপেও অনেক দেবতা বর্ত্তমান ভারতীয় পৌত্তলিকতায় স্থান পাইয়াছে। বেদোক্ত প্রকৃতি-পূজার সঙ্গে চড়ক-পূজা প্রভৃতির তুলনা করিলেই ইহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময়ে যে ব্রাহ্মণগণ বহু পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

এ স্থলে একটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ-রচিত পুরাণে লিখিত আছে যে, এক সময়ে দৈত্যগণ বড় ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী হইয়া উঠিল; উহারা বেদবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা দিতে লাগিল। প্রতিকারের জন্য সকল দেবতা বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষ্ণু মায়ামোহ-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মায়ামোহই বুদ্ধ। মায়ামোহ অর্থাৎ বুদ্ধরূপে বিষ্ণু দৈত্যদিগের মধ্যে অজ্ঞান ও কুশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন; তাহাতেই ক্রমে তাহারা নির্ম্মূল হইল। কি আশ্চর্য্য কৌশল! পুরাণলেখক ব্রাহ্মণ দেখিল যে, মহাপুরুষ বুদ্ধের প্রচারিত মহান সত্য সকলের বিরুদ্ধে একটী কথাও সে কহিতে পারে, তেমন শক্তি তাহার নাই। অতএব বুদ্ধকে অস্বীকার বা আক্রমণ না করিয়া, সে কুটিল কৌশল অবলম্বন করিল। বুদ্ধ দ্বারাই তৎপ্রচারিত মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করাইল। অপার বুদ্ধি-কৌশল! কিন্তু এই কৌশল করিতে গিয়া স্বকীয় উপাস্য দেবতাকে ঘোর প্রবঞ্চক করিতেও কুণ্ঠিত হইল না! ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হওয়া চাই। বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় বটে, হৃদয়ের হীনতারও একশেষ পরিচয় হইল!!

এতক্ষণ ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতার উৎপত্তির বিষয় বলিলাম। পৌত্তলিকতার ভ্রান্ততা ও অপকারিতা অনেকেই স্থূল ভাবে স্বীকার করেন, বিশ্লেষরূপে ভাবিয়া দেখেন না। এখন তাহারই আলোচনা করিব।

পৌত্তলিকতার ভ্রান্ততা বিষয়ে অগ্রে কয়েকটী কথা বলিতেছি। (১) ঈশ্বর অনন্ত। যাঁহাকে ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহাকে কোনরূপেই সীমাবিশিষ্ট মনে করিতে পারা যায় না। অনন্ত ঈশ্বর ক্ষুদ্র আয়তনে আবদ্ধ হইবেন কিরূপে ? তাহা হইলে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেন কৈ ?

(২) ঈশ্বর ইচ্ছাময়, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যদি তাঁহাকে শরীর ধারণ করিতে হয়, তবে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়।

(৩) পরমেশ্বরের আকার কল্পনা করিলেই, তাঁহাকে জড়-শরীরবিশিষ্ট মনে করিতে হয়। জড় পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি গুণ আছে ; জড়গুণ-বিহীন জড় ভাবিতেও পারা যায় না। সুতরাং আকারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে জড়গুণ-বিশিষ্ট বা জড় স্বভাবের অধীন মনে না করিয়া পারা যায় না। ইহাতে উপাসকের মনে ঈশ্বরের ভাব খর্ব্ব ও হীন হইয়া পড়ে। আকার দেওয়া দূরে থাকুক, যাহারা নিরাকারবাদী, তাহারাও ঈশ্বরে মানুষী ভাব আরোপ করিয়া, অনেক সময়ে ধর্ম্মকে হীন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টানদিগের পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিলে, নিরাকার ঈশ্বরকেও যেন রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট ক্রোধোন্মত্ত মানুষের মত দেখিতে পাওয়া যায় ! ঈশ্বরে এইরূপে মানুষীভাব আরোপ করাকে ইংরাজীতে (Anthropomorphism) বলে। এটা বড় গুরুতর আপদ। যদি মহির্ষিদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান

থাকিত, তাহা হইলে এ আপদে পড়িয়া, তাহারাও ঈশ্বরকে দীর্ঘ শৃঙ্গ এবং পুচ্ছবিশিষ্ট মনে করিত, সন্দেহ নাই! ঈশ্বরকে মানুষের আকার দিতে যাইয়া ভরতের উপাস্য বিষ্ণু নিদ্রালু, কৃষ্ণ চরিত্রহীন, এবং শিব নেশাখোর হইয়া পড়িয়াছে! পৌত্তলিকতার বিড়ম্বনার সীমা নাই; সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের পূজার জন্য কদলি, তণ্ডুল এবং ছাগ-শোণিতেরও প্রয়োজন হইয়াছে! কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ বলিতেছেনঃ—

"মন তোমার এই ভ্রম গেলনা;
কালী কেমন তুমি তাই জানলেনা।
জগৎকে সাজালেন যিনি, দিয়ে কত রত্ন সোণা,
তুমি কোন্ লাজে সাজাবে তাঁরে, দিয়ে ছাই ডাকের গহনা?
ব্রহ্মাণ্ড যে মায়ের ছেলে, তাঁর কি আছে "পর" ভাবনা?
তুমি তাঁরে তুষ্ট করতে চাওরে হত্যা করে ছাগল-ছানা!!"

(৪) পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত পূজাই হইতে পারে না। উপাসক মাত্রকেই এক দিকে ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা, এবং অপর দিকে প্রাণস্যপ্রাণ বলিতে হয়। এরূপ বিশ্বাস ভিন্ন প্রকৃত উপাসনা কিরূপে হইবে? বাহিরের পুত্তল "প্রাণস্য-প্রাণ" কিরূপে হইবে? যদি ঈশ্বর বাহিরের পুত্তল হইয়াও ইচ্ছা-শক্তিতে আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, কিম্বা যদি পুত্তলরূপে আমার গৃহে থাকিয়াও, সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন, তবে তো তিনি ঐ ক্ষুদ্র হস্তপদ দ্বারা কিছুই করিতেছেন না, নিরাকার শক্তিস্বরূপ হইয়াই কার্য্য করিতে-

ছেন। ফলতঃ ঈশ্বরকে আকার-বিশিষ্ট মনে করাই আমাদিগের নিকটে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত সাধক বলেন—

"বিশ্বেশ্বর হে, নও তুমি কেবল কাশীবাসী ;
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই হয় আমার বারাণসি।"

(৫) ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না ; ঐরূপ কল্পনাই অসম্ভব। জ্ঞান তাঁহাকে পাইবার পথ পরিষ্কার করে, প্রেম তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী করে, বিশ্বাসে তাঁহাকে দেখা যায়, এবং বিবেকে তাঁহার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান অতীন্দ্রিয় ; তৃণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা বা প্রস্তরে তাঁহার আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে মানুষীধর্ম্ম আরোপ করা, ধর্ম্মের ঘোরতর ব্যভিচার বই কিছুই নহে। উপনিষৎ বলিতেছে,—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

"তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন ; বাক্য বা অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন ; কঠোর তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞান-প্রসাদে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।"

হায়, যে দেশে এ সকল বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, লোকের এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, সে দেশের কি অধোগতি! মাটির পূজা করিতে করিতে সে দেশের লোকের হৃদয় মন "মাটি" হইয়া গিয়াছে!

এ দেশের পুত্তল-পূজকদিগের অনেকেরই মুখে একটী

কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন,—নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরই সত্য, কিন্তু ধর্ম্মার্থীরা প্রথমতঃ তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না; এই জন্যই তাঁহার রূপ-কল্পনার আবশ্যকতা। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, "সাধকানাং হিতার্থে চ ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

এই কথাতে কিছু সার আছে কি না, দেখা যাউক। এই শাস্ত্র-বাক্যের কোন সার নাই, উহা কেবল পৌত্তলিকতার পোষণ-জন্যই রচিত হইয়াছে। ঈশ্বরের রূপ-কল্পনার প্রয়োজন কি? পরিদৃশ্যমান অনন্ত সৃষ্টিতেই ঈশ্বর বিরাজিত। এই বিশ্বে ঐশীভাব উদ্দীপক অনন্ত রূপও আছে। তবে দশ হস্ত, পঞ্চ মুণ্ড, বা তিন চক্ষু বিশিষ্ট অস্বাভাবিক মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাতে "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" করা কেন? জগৎপ্রাণ ঈশ্বরের আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা! কি মূর্খতা!! ঈশ্বরের কি আবার রূপ-কল্পনার প্রয়োজন আছে? ঐ শোন ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক কি বলিতেছেন,—

"গগনের থালে রবি-চন্দ্রদীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডলে চমকে মতিরে;
ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে।" (১)

অনন্ত মহান ঈশ্বরের আবার মাটির মূর্ত্তি! প্রকৃত উপাসক বলিতেছেন। "গগন রূপ থালে চন্দ্র সূর্য্য দীপ এবং তারকা রূপ অসংখ্য রত্ন জ্বলিতেছে, মলয়-পবন ধূপের সুগন্ধ বিস্তার ও চামর ব্যজন করিতেছে। সমস্ত বনরাজি পুষ্পিত হইয়া

(১) শিখ্‌দিগের আদি গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

তাঁহার আরতি করিতেছে।” যদি জড় জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তবে এই রূপে দেখ। ঈশ্বরের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হইতে পারে না, ঈশ্বরের মূর্ত্তির প্রয়োজন নাই। তিনি জড় প্রকৃতির প্রাণ, তিনি প্রাণস্থ পাণ, তাঁহার সত্তা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। তাই ঈশ্বরের উপাসক এক স্থানে বলিতেছেন,—

“এ জগতের মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ ;
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তদুপরে তব নামটী লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার দয়াল নামটী লেখা ;
সুন্দর নামে নামঙ্কিত পাখীর পাখা,
“প্রেমানন্দ” নাম নয়নে লিখেছ।”

অন্যত্র বলিতেছেন,—

আমার হৃদয়-কানন-ভূমি,
কত যে সাজালে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে (তাতে) হতেছ উদয় ;
(আবার) যখন পাপবিকারে,
পড়ে মোহ-অন্ধকারে,
সংসার-সাগর-মাঝে, প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন) আশার আলোক হয়ে দাও হে অভয়।”

কি জড় জগৎ, কি অধ্যাত্ম জগৎ, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও কার্য্যের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব তাঁহার

রূপ-কল্পনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের রূপ-কল্পনায় সাধকের "হিত" না হইয়া অহিত হয়। উহাতে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা-শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। কেননা, যে ব্যক্তি দীর্ঘ কাল অন্ধকারে থাকা সাধন করে, পরে আলোতে বাসকরা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে। যখন ঈশ্বর কি, তাহা একেবারেই বুঝিতে না, তখন যে বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা বা প্রস্তরের পূজা করিতে, তাহা মার্জ্জনীয় ছিল। যদি বুঝিয়া থাক, ঈশ্বর নিরাকার, নিরাকারের সাধনই আরম্ভ কর। যদি বল, নিরাকার-সাধন বড় দুরূহ। তুমি দুরূহ মনে করিলেই কি হইবে? জলে না নামিয়া সাঁতার শিখিবে কি রূপে? মাটি খাইয়া ক্ষুধা-বৃদ্ধি বা দেহ-পুষ্টি করিতে কেহ পারে কি?

পৌত্তলিকদিগের কেহ কেহ আর একটী কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "ব্রহ্ম নির্গুণ; জড় জগতের সঙ্গে না মিশিলে, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের মিলন না হইলে, আমরা ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পরি না। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হওয়া চাই। ব্রহ্ম সগুণ হইলেই "ঈশ্বর" বা পূজার্হ হইয়া থাকেন।"

এই কথাটা শুনিতে নিতান্ত স্থূল বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক তাহাই। "নির্গুণ" কোন পদার্থই হইতে পারে না। গুণবিহীন পদার্থ আকাশ-কুসুম-বৎ কল্পনা মাত্র। ঘোটক-ডিম্বের মত কোন অপ্রকৃত কথাই কেবল গুণবিহীন পদার্থ হইতে পারে। নচেৎ প্রকৃত জড়পদার্থ বা চিৎপদার্থ, যাহাই

হউক না, তাহার কোন না কোন গুণ থাকিবেই। ব্রহ্ম আমাদিগের মত সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃগুণের অধীন নহেন। কোন জড়-গুণ না থাকিলেও, চেতনা বা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও যাহার নাই, এমন পদার্থ আমরা ধারণাই করিতে পারি না। অতএব "নির্গুণ ব্রহ্ম" কথাটা ভ্রান্তি মাত্র।

আর যদি ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেন, তবে প্রকৃতি বা জড়ের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইবে কিরূপে? মিলনরূপ কার্য্যে ইচ্ছা ও শক্তি, এ উভয়েরই প্রয়োজন। জড় ত অন্ধই, ব্রহ্মও যদি নির্গুণ হইলেন, তবে জড়ের সঙ্গে ব্রহ্মের মিলন কে করিয়া দেয়? যদি ব্রহ্মই মিলন করেন, তবে ত মিলনের পূর্ব্বেও তিনি ইচ্ছা ও শক্তি-বিশিষ্ট ছিলেন; তিনি নির্গুণ হইলেন না। আর যদি বল, অপর কেহ উভয়ের মিলন করিয়া দেয়, তাহা হইলে, যে ঐরূপ মিলন করিয়া দেয়, সে জড় কি চিৎ পদার্থ? যদি চিৎ পদার্থ হয়, তবে তোমার প্রকৃতি ও পুরুষ না মানিয়া, আমি সর্ব্ব-পরিচালক সেই চিৎ পদার্থকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব। আমার পূজা নিরাকারেরই হইবে, সাকারের হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের পৌত্তলিকদিগকে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যাহারা পুত্তল পূজায় প্রকৃতরূপে বিশ্বাসী। (২) যাহারা বিশ্বাসী নহে, অথচ ব্যবসায়ের জন্য, বা লোকাচারের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্তল পূজা করে। (৩) যাহারা পুত্তল পূজা করে না, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের জন্য, বা পদমর্য্যাদা-

রক্ষার জন্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া, এবং পৌত্তলিকতার অপকারিতায় উদাসীন থাকিয়া, প্রকারান্তরে পুত্তল-পূজার প্রশ্রয় দেয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকদিগকে আমরা চতুর্ব্বিধ অপরাধে অপরাধী মনে করি। তাহাদিগের প্রথম অপরাধ এই যে, তাহারা নিজ নিজ আত্মাকে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে হীন রাখিয়া অধোগতি প্রাপ্ত করিতেছে।

তাহাদিগের দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তাহারা দেশের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতেছে। ধর্ম্মোন্নতি ভিন্ন কোন সমাজেই ঐ সকল দুরবস্থা বিদূরীত হয় না। দৈহিক বল, লোক-বল, অর্থবল বা বিজ্ঞান-বল, এ সকলই নিকৃষ্ট বল; সামাজিকদিগের হৃদয়-মনের বলই শ্রেষ্ঠ বল, এবং সকল বলের মস্তকে অবস্থিতি করে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ। লোকবল, অস্ত্রবল বা অর্থবল-বিহীন হইয়াও, এক সময় তাঁহারা সমাজে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। ধর্ম্মমত শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে, মানুষের অন্তরে সেই বল সঞ্চিত হয় না। পৃথিবীতে যখনই যে সকল লোক উন্নত হইয়াছে, বা অন্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদিগেরই ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় ও ধর্ম্মমত উন্নত ছিল। বর্ব্বরদিগের উপরে ভারত-বিজয়ী আর্য্যদিগের, নর-বলিদাতাদিগের উপরে বৌদ্ধদিগের, ধর্ম্মহীন বৌদ্ধ ও নাস্তিকদিগের উপরে পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের, নিকৃষ্ট পুত্তলপূজক-

দিগের উপরে মুসলমানদিগের, বিলাসী মুসলমানের উপরে শিখ্‌দিগের আধিপত্য ইহার প্রমাণ। বিদেশে আরও শত শত প্রমাণ আছে; সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

তাহাদিগের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাহারা সমাজে বিষম বৈষম্য ঘটাইয়া রাখে। পৌরাণিক পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই, পূজক বা পুরোহিত নামক এক শ্রেণীর লোক থাকা আবশ্যক। কেননা, ঈশ্বরকে বহু রূপে কল্পনা করিয়া, বহুবিধ পূজার বিধি নির্দ্দেশ করিলে, প্রতি ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ ধর্ম্ম-পালন অসম্ভব; তেত্রিশ কোটি দূরে থাকুক, তেত্রিশ দেবতার ঐরূপ পূজা করাও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কতকগুলি লোককে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী করিয়া, অসত্যে জীবন যাপন করিতে, অপর লোক-সাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, এবং পূজক দিগের নিকটে হীন করিয়া রাখিতে হয়। অনর্থক সমাজ-মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া উভয় পক্ষেরই গুরুতর ক্ষতি করিতে হয়।

তাহাদিগের চতুর্থ অপরাধ এই যে, পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তাহারা সমাজের অনেক পরিশ্রম ও অর্থ অনর্থক নষ্ট হইতে দেয়। সজনে, নির্জনে, দিবসে, নিশীথে যখন ইচ্ছা, জীব হৃদয়স্থ দেবতাকে স্মরণ, মনন ও ধ্যান করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। সে স্থলে অসংখ্য দেবতা কল্পনা করিয়া, এবং অসংখ্যরূপে পূজার ব্যবস্থা করিয়া কত অনাবশ্যক উপকরণেরই সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ণপটহ-ভেদকারী ঢক্কা, নিরীহ ছাগ-শিশু-

সংহারী খড়্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, কুণ্ড, কোষ ও পাঠাঙ্গরী পর্য্যন্ত কত দ্রব্যে সমাজের কত অর্থ ও কত পরিশ্রমেরই অনর্থক প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজের সুখ, সুবিধা বা অধ্যাত্ম মঙ্গলের জন্য, এ সকল আয়োজনের কোনই প্রয়োজন নাই। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার লোক-সংখ্যা সাত কোটি, ইহার মধ্যে হিন্দু প্রায় পাঁচ কোটি হইবে। যদি শরৎকালে এই পাঁচ কোটি লোকের প্রতি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক খানি দুর্গাপ্রতিমা প্রস্তুত হয়, এবং যদি প্রত্যেক প্রতিমায় গড়ে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ হয়, তবে দেখ, প্রতি বর্ষে পঞ্চাশ হাজার প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে, এবং দশ লক্ষ টাকা জলে যাইতেছে। প্রতিমা নির্ম্মাণে যত ব্যয় হয়, পৌত্তলিক পূজার অপরাপর কার্য্যে তাহার দ্বিগুণ ব্যয় হয়। সুতরাং দুর্গোৎসব রূপ পৌত্তলিকতায় বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টাকা মাটি করিতেছে। এক দুর্গোৎসবে যত, সম্বৎসরে অপর সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যদি তাহার দ্বিগুণও ব্যয় হয়, তবে প্রতিবর্ষে দরিদ্র দেশের প্রায় এক কোটি টাকা, আর কত পরিশ্রমই এইরূপে অনর্থক নষ্ট হইতেছে।

অবতার, প্রেরিত এবং মহাপুরুষ।

নবধর্ম্ম-সংস্থাপন, পাষণ্ড-দলন করিয়া ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত-করণ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা পৃথিবীর পাপভার বিমোচন কবিবার জন্য, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে শরীরী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অবতারবাদের ইহাই অর্থ। তাহাতেই ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

> "পরিত্রাণায়চ সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাং
> ধর্ম্ম-সংস্থাপনায়চ সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এই শ্লোকেব তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান বলিতেছেন,—

সাধুদিগের পবিত্রাণের জন্য, পাপীদিগের বিনাশের জন্য, আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে (পৃথিবীতে) জন্ম গ্রহণ কবিয়া থাকি।

গীতার এই উক্তি, এবং এইরূপ অবতারবাদ কতদূর সত্য, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। "অবতরণ" শব্দের অর্থ উন্নত স্থান বা উন্নত লোক হইতে নিম্নভূমি বা নিম্ন লোকে নামিয়া আশা। যদি কৈলাস-কন্দরে, চন্দ্র-মণ্ডলে বা সৌর জগতের পরপারে উর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধদেশে এমন কোন

স্থান থাকিত, যেখানে পরমেশ্বর নিভৃত কক্ষে, বা মন্ত্রীসমাজে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজদরবারে বসিয়া আছেন, মনে করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই মনে করিতে পারিতাম, কোন এক বা একাধিক সময়ে তিনি মর্ত্ত্যধামে মানব-সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বা নামিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বর বা পরমাত্মা কে? যিনি শক্তির শক্তি, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন; জগৎ যাহাতে নিমজ্জিত, জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে যিনি পূর্ণরূপে বিরাজিত; যাঁহার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যায়; যে শক্তিকে ঋষিরা "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছেন, তিনিইত পরমাত্মা বা পরমেশ্বর? তবে তিনি কোথায় আছেন, আর কোথায় নাই? আর কোথা হইতে কোথায়ই বা অবতীর্ণ হইবেন? তাঁহার পক্ষে "অবতরণ" ধারণার বহির্ভূত।

যদি বল "পরমেশ্বর শরীরীরূপে প্রকাশ হওয়াতে, তাহাকেই অবতার বলি।" ইহাও ধারণার বহির্ভূত। কিরূপে, তাহা বলিতেছি। পরমাত্মা সকল বিষয়েই পূর্ণ, তাঁহার সত্তা, তাঁহার জ্ঞান যেমন পূর্ণ, তাঁহার প্রকাশও তেমনই পূর্ণ। কথাটা একটুক জটিল, বিশেষ মনোযোগ ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পরমাত্মা যেমন পূর্ণরূপে আছেন, যেমন পূর্ণজ্ঞানে কার্য্য করিতেছেন, তেমনই পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন। পরমাত্মা যে ভাবে আছেন, আরও কিঞ্চিৎ অধিকরূপে না থাকিলে যদি না চলে, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ রূপে নাই। সেইরূপ

পরমাত্মা যেরূপ জ্ঞানকৌশলে জগৎ পালন করিতেছেন, আরও কিছু অভিনব প্রকারের জ্ঞান-কৌশল না হইলে যদি না চলে, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ নহেন। সেইরূপ পরমাত্মা যেরূপে জগতের নিকটে প্রকাশিত, যদি মধ্যে মধ্যে তাহার অন্যথাচরণ করিয়া প্রকাশিত না হইলে না চলে, তাহা হইলে তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত নহেন। পরমেশ্বর পূর্ণরূপে অবস্থিত নহেন, অথবা পূর্ণ জ্ঞানময়রূপে কার্য্য করিতেছেন না, ইহাও যেরূপ ধারণার বহিভূ্ত, পরমেশ্বর জগতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত নহেন, প্রকাশিত হইবার জন্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন, এ কথাও সেইরূপ ধারণার বহিভূ্ত।

ভগবান পূর্ণরূপেই জগতে প্রকাশিত আছেন। জগত জ্ঞানে ও প্রেমে ক্রমে উন্নত হইলেই, ভগবানকে উজ্জ্বলতর-রূপে দেখিতে পাইবে; ভগবানকে রূপান্তরে প্রকাশিত হইতে হইবে না। সূর্য্য নিত্যই আকাশে সমুদিত রহিয়াছে। গৃহ হইতে বহির্গত হও, পৃথিবীর গতির সঙ্গে আপনার অবস্থিতি-স্থান পরি-বর্ত্তিত কর, সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা দেখ, সূর্য্যকে দেখিতে পাইবে; ক্রমেই সূর্য্যের প্রকৃতি, দূরত্ব ও তোমার সঙ্গে সূর্য্যের সম্পর্কে পরি-জ্ঞাত হইয়া, সুখী ও উপকৃত হইতে পারিবে। তুমিই অগ্রসর হইয়া সূর্য্যকে দেখিবে; উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইবার জন্য, বা জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য, সূর্য্যকে নিশীথ সময়ে তোমার গৃহাঙ্গনে খদ্যোৎবেশে উপস্থিত হইতে হইবে না।

পরমাত্মার অবতরণ বা অভিনব প্রকাশই কেবল ধারণার বহির্ভূত নহে। এরূপ অবতরণ বা প্রকাশের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতাও আমরা ধারণা করিতে পারি না। একটা বৃহৎ কার্য্য, অত্যাশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অসাধারণ কার্য্য করিবার জন্যই কি অবতারের আয়োজন? একজন দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে বিনাশ করা, একজন মহাপাপীর পরিত্রাণ করা, একটা পর্ব্বত অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঘূর্ণিত করা, বা একটা নূতন মত প্রচার করা, ইহাই কি সেই অসাধারণ কার্য্য? যাঁহার অঙ্গুলির উপরে সমস্ত বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে জগতের উৎপাদিকা শক্তি প্রতিদিন অনন্তকোটি জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে, যাঁহার কৌশলে জরায়ুতে জীবের সঞ্চার হইলেই, মাতৃস্তন্যে অমৃত সঞ্চিত হইতে থাকে, যিনি পর্ব্বতকে সমুদ্র করিতেছেন, সমুদ্রকে পর্ব্বত করিতেছেন, যিনি আত্মার আশ্রয় ও চির সহচর থাকিয়া, তোমার মত সাধু ব্যক্তিকে নিয়ত সৎকার্য্যে উদ্বুদ্ধ, এবং আমার মত পাপী ব্যক্তিকেও কুকার্য্যে নিবৃত্ত করিতেছেন, জগতে এমন কি কার্য্য হইতে পারে, যাহার সংশোধন-জন্য তাঁহার মূর্ত্তি-পরিগ্রহ বা রূপান্তরে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন? তুমি আমি যাহাকে অসাধারণ ও অতি অদ্ভুত কার্য্য মনে করি, তাঁহার নিকটে যে তাহাই অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। হিমালয়ের মূলোৎপাটন, বা প্রশান্ত মহাসাগর-বিশোষণ তোমার আমার নিকটে অত্যদ্ভুত কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার নিকটে উহা

ক্ষুদ্র লোষ্ট্র-নিক্ষেপ বা গোষ্পদের জল-শোষণ বই অধিক কিছুই নহে। নেপোলিয়ানের বীরত্ব বা শাক্যসিংহের বৈরাগ্য, তোমার আমার নিকটে অত্যাশ্চর্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই তাঁহার নিকটে শিশুর ক্রীড়া ধরা, বা বালকের কুপথ্যে অরুচি অপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। পরমেশ্বরের স্বরূপ ও শক্তিমত্তাতে তোমার অনভিজ্ঞতাই, তাঁহার রূপান্তর বা ভাবান্তর কল্পনা করিবার হেতু। জগতের কোন কর্ম্মই যে তাঁহার নিকটে দুরূহ নহে, এবং সমগ্র জগৎ-কার্য্যই যে তিনি নির্ব্বিকার থাকিয়া ইচ্ছামাত্রেই সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন, এ কথা ভাল করিয়া বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে পার না, আর অসহিষ্ণু হইয়া নিজের অভিলাষানুযায়ী পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা কর বলিয়াই, পরমেশ্বরের অবতার কল্পনা করিতে তোমার এত ইচ্ছা হয়।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, বিধাতার সাধারণ বিধিতে জগৎকার্য্য পরিচালিত হইতেছে বটে, কিন্তু মানব-জাতি যখন কর্ম্মদোষে ধর্ম্মহীন বা দুরাচার হইয়া পড়ে, তখনই সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য, ভগবানের বিশেষ বিধানের প্রয়োজন হয়; ঈশ্বরের অবতারও সেই বিশেষ বিধানেরই ফল। এই বিশেষ বিধান বা প্রতিকার-বাদের প্রতিবাদ দৃঢ়তার সহিত করা আবশ্যক। অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান-প্রসূত বিধি বা ব্যবস্থার মধ্যে কোনটীকে ইতর আর কোনটীকে বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের পক্ষে ভয়ানক স্পর্দ্ধার কথা,

সন্দেহ নাই। এক বিন্দু শিশির-পাতের সঙ্গে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্যের কি গুরুতর সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা কি আমরা জানি? কোন্ সাহসে বিধাতার ব্যবস্থার মূল্য বা শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে যাইব? একটী পুরাতন বৃক্ষপত্রের স্খলন, ও একটা মহা-ঝঞ্ঝাবাত-প্রবাহ যে একই সাধারণ বিধির ফল, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই, মানুষ এরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। একজন লোকের পাপস্পৃহা, আর একটা জাতির নৈতিক অধোগতি যে একই পদার্থ, এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশোধন, আর জাতীয় সাধুতার উন্নতি-সাধন যে একই কার্য্য, তাহা যে বুঝিতে না পারে, সেই ব্যক্তিই জাতীয় উত্থান-পতন, বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অভ্যুদয় বা তিরোধানকে ভগবানের বিশেষ বিধান মনে করিয়া থাকে।

পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরের রাজ্যে তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া কোন বিষয়ের "প্রতিকার" করিতে হয় না। অল্পজ্ঞান মনুষ্য জীবন-পথে চলিতে চলিতে, নিজের বুদ্ধির দোষে বা পরের পরামর্শে, এমন স্থান বা এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে যে, তখন তাহাকে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বা অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিয়া, তাহার প্রতিকার করিতে হয়। মানুষের যাহা না করিলে চলে না, পরমেশ্বরকেও কি তাহাই করিতে হয়? পরমেশ্বরের ব্যবস্থা পূর্ণ জ্ঞান-প্রসূত, সেই ব্যবস্থার অনন্ত কার্য্য ও ফল তিনি প্রারম্ভেই পরিজ্ঞাত। উপায়ের সঙ্গে যে অপায় আছে, গতির সঙ্গে যে বিচ্যুতি আছে, উন্নতির

সঙ্গে যে বিকৃতি আছে, তাহা তিনি পূর্ণরূপেই জানেন। সুতরাং মানব-জাতির বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার সময়ে, পতন এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ও তিনি এক সঙ্গেই স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষুধায় যেমন আহার আছে, রোগের যেমন ঔষধ আছে, মানবের বা মানব-জাতির পতনেরও তেমনই প্রতিকার মানব প্রকৃতিতেই তিনি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। অতিরিক্ত আহার করিতে করিতে, আপনা হইতেই যেমন আহারে অরুচি জন্মে, সেইরূপ নৈতিক দুর্গতির পথে চলিতে চলিতে, মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বশতঃই জনসমাজ-মধ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে, সমাজ-মধ্যে ধর্ম্ম-সংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক উত্থিত হইয়া থাকেন। তাদৃশ লোকের উত্থানের জন্য, সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মানুষ মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, আর তাদৃশ লোকেরা সিংহের মুখে প্রসূত হন না। সাধারণ লোকে চক্ষু দ্বারা দর্শন ও কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, আর তাদৃশ লোকেরা চক্ষু দ্বারা আঘ্রাণ বা নাসিকা দ্বারা শ্রবণ করেন না। পরিমাণে ব্যতীত, প্রকৃতিতে তাহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। অত্যধিক সাহস, অত্যধিক বৈরাগ্য, অথবা অত্যধিক ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ থাকাতে, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাঁহাদিগকে জনসাধারণ হইতে ভিন্নরূপ মনে করিয়া থাকে। প্রতিক্রিয়ার লক্ষণই এই, যে, অনেক দিনের অভ্যাস বা গতির বিরুদ্ধে উহা প্রবল শক্তিশালী হয়। না হইলে প্রতিক্রিয়া কার্য্যকরী হইতে

পারে না। মানব-সমাজ কোন বিষয়ে অধঃপাতে চলিলে, তাহার প্রতিকারের জন্য, সমাজ-মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যক্তিরা জন্ম-গ্রহণ করেন, যাঁহাদিগের চরিত্রবলে, উদ্যম ও সাহসে সমাজ-মধ্যে বিপরীত স্রোত প্রবাহিত হয়। এরূপ মানুষের জন্মগ্রহণ করা ভগবানের সাধারণ বিধিরই ফল। ইহার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয় না, আপনাকে শরীর ধারণ করিতে হয় না। দিনের পরে রাত্রি ও রাত্রির পরে দিন যেমন বিধাতার সাধারণ নিয়মের ফল, প্রবল ভূমিকম্প হইয়া নিম্ন ভূমি উন্নত, বা নদীগর্ভ গভীরতর হওয়াও সেইরূপ সেই সাধারণ বিধিরই ফল। উহার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। না বুঝিয়া তুমি একটা বিষয়কে সাধারণ, ও আর একটা বিষয়কে অসাধারণ মনে করিয়া থাক বলিয়া, পরমেশ্বরের কার্য্যেও মানুষীভাব আরোপ করিতে যাও, ইহাতে তোমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত, তাঁহারা সত্য সত্যই অবতার ছিলেন কিনা, এবং ঐরূপ অবতারবাদে জগতের কি ইষ্ট বা অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাউক। ঐতি-হাসিক যুগে ভারতবর্ষে দুইটী মাত্র অবতারের উল্লেখ আছে, প্রথম বুদ্ধ, দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ। কিন্তু এই দুই অবতার সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ রহিয়াছে। গৌরাঙ্গ ত হিন্দুদিগের দশ অবতারের মধ্যেই গণ্য হন নাই। বুদ্ধ সম্বন্ধেও কতক লোকের যথেষ্ট আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই অবতার

ছাড়া, আর যাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ বা নিদর্শন কিছুও পাওয়া যাইতে পারে, তন্মধ্যে রামচন্দ্রই আলোচনার জন্য নানা প্রকারে প্রশস্ত। অতএব রামাবতার লইয়াই আলোচনা করা যাউক।

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাল্যকালেই বিলক্ষণ ধর্ম্মবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়াছিলেন; পিতার আদেশ-পালন-জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নীকে বনবাসে দিয়াছিলেন। বনবাস-কালে পত্নী-হরণকারী রাবণ নামক রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, এবং সমুদ্রে সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে। এই সকল উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, রামচন্দ্র পরমেশ্বরের অবতার কেন হইবেন? রাজবংশে ত বহু লোকই জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকালেও অনেকেই ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন হয়। পুরাণোক্ত ধ্রুব বা প্রহ্লাদ ত বাল্যকালেই পরম ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। রজপুত ক্ষত্রিয়েরা অনেকেই বাল্যকালে বিলক্ষণ সাহসী ও রণনিপুণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের বীরত্ব অপেক্ষা লক্ষ্মণের বীরত্ব কম নহে। রামচন্দ্রের স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা ভরতের স্বার্থত্যাগ কম নহে। রামচন্দ্র যদি সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়া থাকেন, গ্রীকেরাও ত ট্রয়ের যুদ্ধে দ্বাদশ শত জাহাজ দ্বারা সমুদ্র মধ্যে প্রকাণ্ড সেতু বাঁধিয়াছিল। তবে রামচন্দ্র কেন পরমেশ্বরের অবতার বিবেচিত হইলেন? একাধারে বহু পরিমাণে বহু গুণ দেখিয়া, অল্প-

বুদ্ধি লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার মনে করিয়া লইয়াছে। অথবা তাঁহাকে নায়ক করিয়া যে মহাকবি কাব্য লিখিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে ঐরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নতুবা অপর লোকের সঙ্গে তাঁহার জীবন বা চরিত্রের ভিন্নতা কি আছে? ফলতঃ একরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, মানুষ মাত্রেই ভগবানের অবতার। ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষের উৎপত্তি, ভগবানের শক্তিতেই মানুষ জীবিত, এবং ভগবানের ভাবেই মানুষ পরিচালিত। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জীবনই ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অর্থে রামচন্দ্র অবতার হইলে, তুমি আমি সকলেই অবতার। রামচন্দ্র বা কৃষ্ণচন্দ্র মহাশক্তিশালী, মহাধার্ম্মিক বা বহু প্রকারে মহামহিমান্বিত হইলেও, অপরাপর লোকের মত মানুষ, পরমেশ্বর নহেন।

প্রকৃত মনুষ্যই হউক, বা কল্পিত মনুষ্যই হউক, মনুষ্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস বা প্রচার করিলে, মানব-জাতির গুরুতর ক্ষতি হইয়া থাকে। ঐরূপ করাতে, সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত পরমেশ্বরকে কেবল খর্ব্ব করা হয় না, নানাপ্রকার দোষ এবং ত্রুটীও তাঁহার উপরে আরোপিত হইতে পারে। মানুষ অতি ক্ষুদ্র জীব; হৃদয়-নিহিত ভক্তির প্রভাবে ক্রমে পশুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবভাবাপন্ন হইতেছে। মানব জাতির সম্মুখে পরমেশ্বর স্বয়ং আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। সেই আদর্শকে যে পরিমাণে খর্ব্ব করা যাইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য-জাতির বর্ত্তমান ও ভাবী অকল্যাণ সাধিত হইবে। মানুষ যত বড়ই হউকনা কেন,

তাহার ক্ষমতা ও প্রভাব অসীম হইবে না। রামচন্দ্রকে ঈশ্বর সাজাইয়া, তাঁহাকে রাবণের নিকটে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, ঐশী শক্তির অবমাননা করা হইয়াছে। স্বার্থসাধনের জন্য ঈশ্বররূপী রামচন্দ্রদ্বারা বালীবধ করাইয়া, ঐশী মহিমা কলঙ্কিত করা হইয়াছে। গোষ্পদকে যদি অনন্ত সমুদ্র বলি, জড়বুদ্ধিকে যদি মহামহোপাধ্যায় বলি, তাহা হইলে সমুদ্রের প্রসার-জ্ঞান যে খর্ব্ব হয়, আর পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা যে রক্ষা পায় না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভগবানকে, উপাস্য দেবতাকে এইরূপে খর্ব্ব করিয়া লওয়াতে, লোক-চরিত্রে নানা দোষ স্পর্শিয়াছে, ঈশ্বরের নাম করিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, নরহত্যা ও ব্যভিচার পর্য্যন্ত জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে!

অবতারবাদ লইয়া এতক্ষণ বাদানুবাদ করিলাম। অবশেষে একটা প্রশ্ন মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রশ্নটা এই,—যদি ভূভার-হরণ-জন্য বা তাদৃশ কোন কার্য্যের জন্য, ভগবান কোন সময়ে শরীর ধারণ করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই শরীরধারী প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যক্তি নহেন, সাময়িক কার্য্যসাধনের জন্য পরমেশ্বরের মূর্ত্তি-পরিগ্রহ মাত্র। তাহাই যদি হয়, তবে সেই প্রয়োজন সাধিত হইয়া গেলে, সেই শরীরধারী পৃথিবী হইতে চলিয়াগেলে, আর তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়া গেল, ঈশ্বরের পার্থিব মূর্ত্তির আর প্রয়োজন কি? অতএব আমরা কি ইহাই বিশ্বাস করিব যে, রামচন্দ্র, গৌরাঙ্গ বা বুদ্ধ এখন আর

নাই ?—পরমেশ্বরের পরিগৃহীত মূর্ত্তিরূপে তাঁহারা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ? প্রয়োজনাবসানে, যে চিন্ময় পরমেশ্বর, সে চিন্ময় পরমেশ্বরই হইয়া গিয়াছেন, যে গোলোকবাসী ভগবান, সেই গোলোকবাসীই হইয়াছেন। তাহা হইলে আর এখনও এদেশে রাম, কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ প্রভৃতির পূজা বা উপাসনার ব্যবস্থা কেন ? মনুষ্য-বুদ্ধির অযৌক্তিকতা অতি বিস্ময়কর সন্দেহ নাই !

কোন কোন লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভূভার-হরণ বা নবধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য, পরমেশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলেও, সময়ে সময়ে তাঁহার পুত্র, মিত্র বা বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন প্রিয় পাত্রদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে,—

God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but will have eternal life.

ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ হইয়াছে যথা,—পরমেশ্বর জগতকে এতই প্রেম করিলেন যে, তাঁহার একজাত পুত্রকে দান করিলেন ; যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারিরা বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে।

এইরূপ পুত্র, মিত্র বা অনুগ্রহের পাত্রদিগকে "প্রেরিত" বলে। সুতরাং এইরূপ মতকে আমরাও "প্রেরণবাদ" বলিতে পারি। অবতার-বাদের "অবতরণে" যে আপত্তি, প্রেরণবাদের "প্রেরণেও" সেই আপত্তি। স্থান, কাল ও পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া

যে পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি কোথা হইতে কাহাকে কোথায় প্রেরণ করিবেন? যাহা কোন স্থানে ছিল, তাহা স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেওয়াই "প্রেরণ" কথার অর্থ। ভগবান কি আমাদিগকে ছাড়িয়া, স্বতন্ত্র পরিবার লইয়া আছেন, যে তাঁহার পুত্র, বন্ধু ও বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রেরা তথায় তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন, আর তিনি কখনও কখনও তাঁহাদিগের কাহাকেও এই পৃথিবীতে পাঠাইয়া থাকেন? তাহা কখনই নহে।

কেহ কেহ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও, এই মতের পোষণ করিয়া থাকেন যে, সত্য সত্যই প্রেরিতগণ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে অবস্থিতি করিতেন; সুতরাং প্রেরণ করিয়াছেন, বলাতে দোষ স্পর্শে না। এই স্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যদি "প্রেরিতগণ" পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে অবস্থিতি করিতেন, আমরা কি তাঁহার ইচ্ছাতে অবস্থিতি করিতাম না? আমরা কি ভগবানের ইচ্ছার বাহির হইতে উৎক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি? তাহা না হইলে তাঁহাদিগকেই কেবল "প্রেরিত" বল কেন? ভগবানের ইচ্ছাতেই জগৎ-কার্য্য চলিতেছে, ভগবানের ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে সকল মানুষের সৃষ্টি। এরূপ স্থলে কেহ প্রেরিত, আর কেহ প্রেরিত নয় বলিয়া বিবেচিত হইবার কারণ কি?

"প্রেরিতগণ ভগবানের ইচ্ছাতে ছিলেন," এই কথাটার ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। চন্দ্রে কলঙ্ক

আছে, অর্থাৎ যত কাল চন্দ্র আছে, তত কাল কলঙ্কও আছে; মেঘে বিদ্যুৎ আছে, অর্থাৎ যত কাল মেঘ আছে, তত কাল উহাতে বিদ্যুৎও আছে; এইরূপে কি যতকাল ঈশ্বর আছেন, ততকাল তাঁহার ইচ্ছাতে "প্রেরিতগণ" রহিয়াছেন? তবে যে "প্রেরিতগণ পরমেশ্বরের সমকালবর্ত্তীই হইলেন। কেননা, পরমেশ্বরের ইচ্ছা, ও ইচ্ছার আধার পরমেশ্বর ত অভিন্ন। অনেকে এরূপ অদ্ভুত মতও পোষণ করিয়া থাকেন যে, প্রেরিত-গণ পরমেশ্বরের নিত্য সহচর! পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে থাকি-লেই যে, সে পদার্থ নিত্য হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে ত মনুষ্য মাত্রেই পরমেশ্বরের নিত্য সহচর, বলিতে হইবে।

ইচ্ছা পদার্থটার প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই, লোকের এরূপ ভুল হইয়া থাকে। তুলনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে না; তথাপি তুলনা দ্বারা বুঝাইতে গেলে, কথাটা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। জড় পদার্থের পক্ষে গতি যেমন, আত্মা বা চিৎ পদার্থের পক্ষে ইচ্ছা সেইরূপ। একটা গোলকের আয়তন ও গুরুত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু গতি নির্দ্দিষ্ট নাই। আজ গোলক যত বড় ও ভারী, কালও তত বড় এবং তত ভারী হইবে। কিন্তু উহার গতি সকল সময়ে সমান হইবে না, উহার উপরে প্রযুক্ত শক্তি এবং প্রতিঘাতানুসারে উহার গতি হইবে। সেইরূপ কোন চিৎ পদা-র্থের, অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি ও শক্তিগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু উহার ইচ্ছার নির্দ্দেশ নাই। কোন আত্মার বল কত, ধারণ-ক্ষমতা

কত, জ্ঞান বা ভক্তি কত, তাহার পরিমাণ আছে, কিন্তু তাহার ইচ্ছার কোন নির্দ্দেশ নাই। গোলক যেমন শক্তিপ্রযুক্ত হইলেই যখন তখন যথায় তথায় যাইতে পারে, আত্মাও সেইরূপ যাহা ইচ্ছা তাহাই "ইচ্ছা" করিতে পারে। এক সের ভারী গোলক কল্য দেড় সের হইবে না। অল্প জ্ঞান-আত্মাও স্থানান্তরে প্রভূত জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পড়িবে না। কিন্তু গোলক আজ উত্তরে, কাল দক্ষিণে চলিতে পারে, এখানে মুহূর্ত্তে শত হস্ত, আর সেখানে মুহূর্ত্তে সহস্র হস্ত উহার গতি হইতে পারে। আত্মাও আজ একরূপ ইচ্ছা করিতে, কালি অন্যরূপ ইচ্ছা করিতে পারে। আত্মার এই যে স্বাধীনতা, ইহারই নাম ইচ্ছা, বা ইচ্ছা-শক্তি। মানবের এই ইচ্ছাশক্তি, এই অধ্যাত্মিক স্বাধীনতা তাহার মঙ্গলের জন্যই, চতুর্দ্দিকের অবস্থা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে গতিপ্রাপ্ত influenced হয়, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণ, স্বতন্ত্র ও নিরবলম্ব। তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা স্বাধীন ও অপ্রতিহত। ক্ষুদ্র ইচ্ছা-শক্তি লইয়া মানুষই যদি নিত্য নূতন কল্পনা করিতে পারে, সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বর কি তাহার অনন্ত ও অপরাজিত ইচ্ছার বলে জীবাত্মার সৃষ্টি করিতে পারেন না?

যদি তিনি জীবাত্মার সৃষ্টিই করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পারিতেন, আজিও পারেন, এবং চির-কালই পারিবেন। ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে "প্রেরিতগণ" ছিলেন বলি কেন? যদি প্রেরিতগণ পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাতে ছিলেন, না বলিয়া, তাঁহার

ইচ্ছাতে আমাদিগেরই মত পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, বলি না কেন ? তাহা হইলে আর প্রেরিত ও অপ্রেরিতে প্রভেদ কি রহিল ?

কেহ কেহ জীবের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহের তারতম্য করিতে যাইয়া, অনেক অদ্ভুত মত পোষণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ কোন কোন লোকের মতে জীব তিন প্রকারের, যথা,—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বদ্ধ। এই তিন প্রকার জীবের মধ্যে মুক্ত জীবেরাই নাকি পরমেশ্বরের নিত্য সহচর। এই অদ্ভুত মতের মধ্যে দুইটা অতি ভয়ঙ্কর অসত্য অবস্থিতি করিতেছে। কোন জীবাত্মাকে পরমাত্মার নিত্য সহচর বলিলে, পরমাত্মাকে উক্ত জীবাত্মার স্রষ্টা বলা যাইতে পারে না। ঐ মত স্বীকার করিতে গেলে, পরমেশ্বরকে অদ্বিতীয় এবং আদি কারণ বলা যায় না। যদি বল, পরমেশ্বর "মুক্ত" জীবদিগকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার নিত্য সহচর করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা হইলে বলিব, পরমেশ্বর আমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিত্য সহচর করিয়া রাখিয়াছেন। কেননা, পরমাত্মার নিত্য সহবাস ব্যতীত, কে এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে ? সুতরাং কোন জীবাত্মাই পরমাত্মার নিত্য সহচর হইতে পারে না।

পরমেশ্বর জীবের মধ্যে কাহাকেও বিশেষ অনুগ্রহ করেন, একথাও মিথ্যা। পরমেশ্বরের সূর্য্য বা বায়ু কি ছোট, বড়, পাপী বা সাধুর বিচার করে ? পরমেশ্বরের কৃপাও সেইরূপ কাহাকেও অধিক, কাহাকেও অল্প উপকৃত করে না। পরমে

শ্বরের কৃপা অহেতুকী, অযাচিত, অনন্ত ও অপরাজিত না হইলে, ঐশী কৃপায় ঐরূপ তারতম্য হইতে পারিত। পরমেশ্বরের পিতামহের নিকটে যদি তোমার কিছু দাদন দেওয়া টাকা প্রাপ্য থাকিত, আর পরমেশ্বরের মাতামহের শস্যক্ষেত্র যদি আমা কর্ত্তৃক পয়মাল হইত, তাহা হইলে তোমার ও আমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহের তারতম্য হইতে পারিত। তুমি যত কেন বড় হওনা, তোমার প্রতি পরমেশ্বরের "পূর্ণ" কৃপা, আমি যত কেন ছোট হইনা, আমার প্রতিও তাঁহার "পূর্ণ" কৃপা। যাহা কখনও, কোন অবস্থাতেও, কোনরূপেও "পূর্ণ" না থাকিয়া পারে না, তাহার মধ্যে আবার ইতর বিশেষ কিরূপে হইবে? তুমি উন্নত হও, ধন্য হইবে, সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অনুন্নত আছি বলিয়া, ভগবানের কম কৃপা-ভাজন কখনই নই।

নিজ কর্ম্মফলে, শিক্ষার দোষে বা কৌলিক কারণে মানুষ বড় ও ছোট হইতে পারে, সন্দেহ নাই। আবার আজ যে ছোট আছে, অবস্থান্তর ঘটিলে, বা যত্ন করিলে, সে কাল বড় হইতেও বড় হইতে পারে। সুতরাং মানুষ সকলেই এক জাতীয় জীব; পরমেশ্বরের চক্ষে কেহ উপেক্ষার পাত্র, আর কেহ অধিক অনুগ্রহ-ভাজন নহে। সুতরাং প্রেরিত বা "মহাপুরুষ" বলিয়া যাঁহাদিগকে ভিন্ন করিয়া রাখিতে চাও, তাহারা ভিন্ন নহেন। তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে ভিন্নতা কিছুই নাই। শক্তি ও চরিত্র দেখিয়া, যদি ধর্ম্মজগতে এইরূপ বিশেষত্ব প্রদান করিতে যাও,

তাহা হইলে দর্শন, বিজ্ঞান এবং কাব্য-জগতেও সেইরূপ বিশেষত্ব না দিলে অন্যায় হইবে। ঈশা, মুশা, মহম্মদ ও চৈতন্য যদি বিশেষ মনুষ্য হন, তাহা হইলে কপিল, ক্যাণ্ট ও নিউটন, এবং বাল্মীকি, কালিদাস ও সেক্ষপীয়রকেও "বিশেষ" মনুষ্য বলিতে হইবে। উঁহারাও কি অপরাপর মনুষ্য অপেক্ষা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ?

মহত্ত্ব দেখিলেই, তাহাতে দৈবশক্তি বা দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ আরোপ মানুষ করিয়া থাকে। এককালে রাজা বা রাজবংশীয় লোকদিগকেও লোকে এইরূপ বিশেষত্ব প্রদান করিত, রাজাকে দেবাংশ মনে করিয়া পূজা করিত। হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—অরাজক অবস্থাতে প্রকৃতিপুঞ্জকে অরক্ষণীয় দেখিয়া, পরমেশ্বর রাজার সৃষ্টি করিলেন; ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবতার শক্তিতে রাজাকে ভূষিত করিয়া পাঠাইলেন, ইত্যাদি। কেবল ভারতবর্ষে নহে, মধ্যযুগে ইউরোপেও রাজাদিগের দৈবীস্বত্ব, Divine right of kings স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল রাজা কেন ? প্রভূত ক্ষমতাশালী বলিয়া, অসাধারণ যুদ্ধশক্তি, কাব্যশক্তি বা চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও দেবাংশ বা দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন।

কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে, মানবজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, এইরূপ ধারণা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইয়া, বাণিজ্য সুগম হইয়া, এখন যেমন জন-সমাজে

ধন-বিভাগ (Distribution of wealth) হইতেছে, সাধারণ শিক্ষার প্রবর্ত্তন, এবং ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মমত প্রচারের সুবিধা, এবং মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রাদির প্রচলন হইয়া, সমাজ-মধ্যে এখন সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগও হইতেছে। পূর্ব্বকালে কোন স্থানে দুই একজন লোক ধনী, ও অপর সাধারণ লোক দরিদ্র, দুই একজন লোক জ্ঞান ও ধর্ম্মে অত্যন্ত উন্নত, আর সাধারণ জনগণ জ্ঞানধর্ম্ম-হীন দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীতে এই বৈষম্যের অবস্থা ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে; সুতরাং মহাপুরুষ-বাদেরও মহিমা খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে।

এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, জগত উন্নতিশীল; মানব-জাতির উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীনরূপেই হইবে। জ্ঞানধর্ম্ম-সম্বন্ধে উন্নত সত্য সকলই যে কেবল মানুষ আবিষ্কার করিবে, তাহা নহে, ঐ সকল সত্য ক্রমেই অধিকাংশ মানব আয়ত্ত করিবে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন যথেচ্ছাচার-শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়া, তাহার স্থলে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেইরূপ মানব-জাতিতে ব্যক্তি বিশেষের লব্ধ অসাধারণ অধ্যাত্ম মহিমার স্থলেও, জনসাধারণের জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি স্থান লাভ করিতেছে। একজন মহর্ষি, একজন মহাকবি বা একজন মহাপণ্ডিতের তিরোধান হইলে, পূর্ব্বকালে তাঁহার স্থল-পূরণ করা কঠিন হইত। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সেই অসুবিধা ক্রমেই অল্পতা প্রাপ্ত হইতেছে।

যাহারা মনে করেন, মহাপুরুষের উত্থান না হইলে,

জগতের কোন গুরুতর কার্য্য সাধন হইবে না, তাঁহারা ভ্রান্ত। মানবজাতির প্রাথমিক অবস্থায়, যখন মানুষ স্থূল দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিলে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না, তখন মহাপুরুষ বা বড় লোকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মানু-ষের জ্ঞান-ভক্তির উন্নতি হইয়া, মানবজাতি ক্রমেই এরূপ সক্ষমতা লাভ করিতেছে যে, এখন আর সেইরূপ স্থূল দৃষ্টান্তের তত প্রয়োজন নাই। আপনার জন্য যে আপনি চিন্তা বা অনুসন্ধান করিতে পারে না, তাহার জন্যই দৃষ্টান্ত বা অনুজ্ঞার প্রয়োজন। কিন্তু যাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি জন্মিয়াছে, নীতি ও আদর্শ লক্ষ্য করিয়া যে চলিতে পারে, তাহার জন্য উহার তত প্রয়োজন নাই। সুতরাং মঙ্গলময় বিধাতার বিধি অনুসারেই, মহাপুরুষের মহিমা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস হইতে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। প্রেমময় পরমেশ্বরের কৃপায় ধর্ম্মজগতেও সাম্য ও স্বাধীনতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জগতে এমন সুখের দিন আসিবে, যখন মানবজাতির অধিকাংশ মনুষ্য অসহায়ের মত দুই চারি ব্যক্তির পদাশ্রয় করিবে না, কিন্তু সকলেই সক্ষমতা লাভ করিয়া, পরস্পরের স্কন্ধে হাত দিয়া, প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে জীবনের পথে অগ্রসর হইবে; "মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা" বলিয়া অন্ধকারে পরের হাত ধরিয়া না চলিয়া, মানুষ আপনার জ্ঞান, আপনার ভক্তি ও আপনার বিবেকের আলোকে পথ দেখিয়া উন্নত লোকে চলিয়া যাইবে।

তিন প্রশ্নের সদুত্তর।

১ম প্রশ্ন—বল, দেখি ভাই, কি হয় মোলে ?

কেউ বলে, "তুই ভূত হবি"; কেউ বলে, "তুই স্বর্গে যাবি" আবার কেউ কেউ বলে, "তুই শূন্যে উড়ে যাবি;"—কার কথা বিশ্বাস করিব ? আমার মায়ার স্বপ্নও ভাঙে না, আমার মরণ-কথাও মনে হয় না ; তার পর মলে কি হবো, এত দূরের কথা ভাবনাতেও আইসে না। যদিও সে কথা মনে পড়িল, তাতে আবার এত ভিন্ন মত! কার কথা বিশ্বাস করিব ?

কেউ বলে—"তুই ভূত হবি।" ভূত কাহাকে বল ভাই ? লোকে যাহাকে পঞ্চভূত বলে, সেই কি সে ভূত ? যদি বট গাছে থাকিতে হয়, ঝড়ের কাঁধে চাপিতে হয়, আর মানুষের ঘাড় মট্‌কাইতে হয়, তবেত সেই পঞ্চভূত হওয়াই আবশ্যক। রহস্য ছাড়িয়া স্বরূপ কথা বলি ;—মরিয়া কি আবার ভৌতিক শরীর লইতে হইবে ?

জড় শরীর পাইলে কি হবো ভাই ? পশুপক্ষী বা কীট-পতঙ্গ হইব কি ? যে কাক চিরদিন "কা কা" ভিন্ন শব্দ করিতে জানিল না, যে বলীবর্দ্দ চিরকাল কেবল ভূকর্ষণই করিতেছে,

আমি মরিয়া সেই কাক, বা সেই বলদ হইব কি? আমার অন্তরাত্মাটা কি মোমের খেলনা যে, টিপিলেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে? নহিলে জীবান্তরে জন্ম-পরিগ্রহ কিরূপে সম্ভবে? আমার এই অপার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, আমার এই বিচিত্র কল্পনা-শক্তি, আমার এই উদ্বেলিত ভগবদ্ভক্তি, আমার জীবনের এই অনন্ত, কিন্তু অতৃপ্ত উন্নতিশীলতা কি গো-জন্মে স্বার্থক হইতে পারে? এমন অসম্ভব কল্পনা মানুষের মনে আসিতেই পারে না। যদি বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ভাষা-জ্ঞানাদি লইয়াও গোরু হওয়া যায়, তবে আর গো-জন্মের প্রয়োজন কি? আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমিই যে তাদৃশ পরম গোরু!

পৌরাণিক বলে, কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য মানুষ ইতর প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা অতি অল্পবুদ্ধির কথা। কর্ম্মফল-ভোগের অর্থ কি? না, সৎকার্য্যের পুরস্কার ও দুষ্কার্য্যের দণ্ড পাওয়া। সাধুতার পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান যিনি করেন, সেই বিধাতা ন্যায়বান্ ও শিবসংকল্প। বিধাতা শিবসংকল্প না হইলে, কর্ম্ম-ফল-বিধানের উদ্দেশ্য কি? আর ন্যায়-বান্ না হইলেই বা কর্ম্মফলের অর্থ কি? কর্ম্মফলে যদি সাধু-তার জন্য দণ্ড, বা দুষ্কৃতির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহাকে কি আর কর্ম্ম-ফল বলা যায়? অতএব কর্ম্ম ফলের অর্থ এই যে, ন্যায়বান্ মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবের মঙ্গলের জন্য, তৎকৃত সদসৎ কার্য্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিয়া থাকেন।

ইহাই যদি হইল, তবে মানুষ মরিলে গোরু হইবে কেন?

দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধীর সংশোধন হয়, তবে মানুষকে গোরু করিলে, তাহার কি সংশোধন হইতে পারে ? যাহাকে দণ্ড দেওয়া যায়, সে যদি তাহা বুঝিতে না পারে,—সে যদি এরূপ মনে না করে, "হায়, আমি এরূপ ছিলাম, আত্মাপরাধে এরূপ হইয়াছি ; কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা আবার উন্নত অবস্থা পাইব !"—তবে আর তাহার সংশোধন হইবে কিরূপে ? হে পৌরাণিকের শিষ্য, তুমি কি ভ্রান্ত ! তুমি বল কি ?—না, দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট মানুষকে সংশোধন করিবার জন্য, ভগবান তাহাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিহীন গোরু করিয়া থাকেন ! তোমার যুক্তিতে, শয্যাতে কীট হইলে, সমস্ত শয্যা দগ্ধ করাই কর্ত্তব্য !!

তবে কি ভাই, মরে মানুষ হবো ? সংসারে কেউ কি মরে আবার মানুষ হয়েছে ? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত বলিতে পারে না, সে পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল। পূর্ব্ব-জন্মে যে মানুষ ছিল, মবে তাহার দেহ গিয়াছে, রক্ত মাংস গিয়াছে ; বুদ্ধির পক্কতা বা স্মরণশক্তি ত যায় নাই ? তবে পূর্ব্ব-জন্মের কথা তাহার মনে নাই কেন ?

স্মৃতি কি ?—মনুষ্য মনের একটা শক্তি। সে শক্তি বা শক্তির কার্য্য বজায় থাকে কিরূপে ?—অভ্যাস ও আলোচনা অবলম্বন করিয়া। বহুকাল যাহা অভ্যস্ত বা আলোচিত নহে, মন তাহাই ভুলিয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তুমি যে স্থান দেখিয়াছ, যদি তৎপরে সে স্থান আর না দেখ, অথবা যদি কোন সময়ে তোমার চিন্তাতেও তাহার কিছু না উঠে, তবে

তুমি নিশ্চয়ই তাহা ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছ, কাল তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। তবে মানুষ আজ মরিয়া, কালই নিজ জীবনের বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায় কিরূপে? যদি বল, নূতন স্থান বা অভিনব অবস্থায় ভাবযোগ (association of ideas) বিলুপ্ত হইয়া, স্মৃতির কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়; তাহার উত্তর এই যে, মানুষ মরিয়া আবার মানুষ হইলে, এমন নূতন অবস্থাপন্ন হয় না, অথবা এমন নূতন স্থানে পড়ে না যে, জন্মান্তরের অবস্থা বা অবস্থিতি-স্থানের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য থাকে না। নূতন স্থান বা নূতন অবস্থাতে স্মৃতির ব্যাঘাত ঘটায় বটে, কিন্তু সদৃশ অবস্থায় স্মৃতির উদ্রেক করে না কেন? সেই পৃথিবী, সেই বৃক্ষলতা, সেই পানভোজন, সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই আস্বাদ, তবে কেন ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে না? তাই বলি ভাই, আর যাই হই, মরে কখনও মানুষ হইব না।

তবে কি উড়ে যাবো? আমার মন বলে না উড়ে যাবো, প্রাণ বলে না উড়ে যাবো; কেবল তোমরা কেউ কেউ এ কথা বলে থাক। তোমাদিগের কথা বিশ্বাস করিব কেন? আমার আত্মার মূলে যে জ্ঞান নিহিত, সেই সহজজ্ঞান যেমন বলিতেছে, "আমি আছি," তেমনই বলিতেছে, "আমি থাকিব"; এ সংস্কার আমি অন্য কাহারও নিকটে পাই নাই। এই জ্ঞান আমার উপার্জ্জিত নহে। সেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া, যদি তোমাদিগের কথায় বলিতে হয়, আমি থাকিব না; তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, আমি নাই। বল দেখি ভাই, এই যে

তোমার সম্মুখে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত জীবন্ত "আমি" দণ্ডায়মান আছি, কেহ যদি বলে, এই "আমি" নাই, তবে কি আমি বিশ্বাস করিব যে, সত্য সত্যই "আমি নাই" ?"

আমার সহজ-জ্ঞান যাহা বলে, তোমার সহজ জ্ঞানও তোমাকে তাহাই বলে। যদি তুমি সেই প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপলাপ করিয়া, উহা অস্বীকার কর, তোমাকে কতকগুলি যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার কথা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। বল দেখি ভাই, তুমি যে বল, আমি থাকিব না, তুমি কিরূপে জানিলে যে, আমি থাকিব না ?

তুমি যাহা বলিবে, তাহা যেন আমার মনেই উঠিতেছে। "মানুষ মরিলে, আর তাহাকে দেখিতে পাই না। রাম, শ্যাম মরিল, আর তাহাদিগের কিছু রহিল না; তুমি মরিলেও তোমার কিছু থাকিবে না। অভিজ্ঞতা (Experience) সমস্ত জ্ঞানের কারণ। কোন মানুষ মরিলেই আর কিছু থাকিতে দেখি না, সুতরাং তুমি মরিলেও, তোমার কিছু থাকিবে না।"

হে দার্শনিক-শিষ্য, তোমার কথাই যেন মানিলাম। মানিলাম, যে অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের কারণ। কিন্তু আমার কথার উত্তর দাও। এই যে আমার হস্তে কাষ্ঠখণ্ড দেখিতেছ; উহাকে দগ্ধ কর, উহা ভস্ম হইয়া যাইবে। কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে যে উত্তাপ আছে, তাহা উত্তাপে মিশিবে, উহার মধ্যে যে জল আছে, তাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। এইরূপে কাষ্ঠখণ্ড

ভূতত্ব প্রাপ্ত হইবে। মানুষও মরিয়া এইরূপে ভূতত্ব পায় কি? মানুষ মরিলে তাহার দেহ ভূতত্ব পায়, ইহা তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, বিজ্ঞান দ্বারাও বুঝাইয়া দিতে পার। কিন্তু মানুষ জীবিত থাকিতে যে তাহার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ছিল, মানুষ মরিয়া তাহা কোথায় গেল? তাহাও ভূতত্ব পাইয়াছে, ইহা তুমি দেখাইতে বা বুঝাইয়া দিতে পার কি? না পারিলেই, তোমাকে বলিতে হইবে, "কি হইল, কোথায় গেল, জানি না।" তুমি অভিজ্ঞতাবাদী, ইহার অতিরিক্ত বলা তোমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। অধ্যাত্মতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব-বিষয়ে যখন তুমি কিছু উপলব্ধি করিতে বা প্রমাণ করিতে না পার, তখন ভাই অভিজ্ঞতাবাদি, তুমি গোলযোগ না করিয়া, পিতার সুপুত্রের মত বলিও,—"জানিনা, বুঝিনা।" পণ্ডিতদিগের মতে তোমাকে এ কথাও বলিতে পারি,—"When you can not unriddle, learn to believe. রহস্যভেদ করিতে পার না বলিয়া, অবিশ্বাসী হইও না।

মরিলে যে আমি উড়িয়া যাইব না, তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আমার জীবন অনন্ত উন্নতিশীল। আমার জীবনের উপকরণ—আমার জ্ঞান, আমার ভাব, আমার ইচ্ছা অনন্ত উন্নতি-মুখ। শরীরটা যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলই বিলোপ পাইবে, এও কি সম্ভব? তাই বলি ভাই, মরিলাম আর সকল ফুরাইল, ইহা কখনও হইবে না।

ঐযে সামান্য অঙ্কুরটী দেখিতেছ, কালে উহা বৃক্ষ হইবে; সেই বৃক্ষে ফল হইবে। বৎসরে বৎসরে সকল বৃক্ষেরই এ-

রূপে ফল হয়, সকল বৃক্ষই একরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তারপর বৃক্ষ ক্রমে পুরাতন হইয়া মরিয়া যায়, মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। এক বৎসর, দুই বৎসর, শত বৎসর বা সহস্র বৎসরে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব চরিতার্থ হয় ;—যাহা হইবার, তাহা হইয়া, বৃক্ষ আর থাকে না। আমরা বুঝি, বৃক্ষের জীবনের নিয়তির পরিসমাপ্তি হয়।

মানব-জীবনেরও নিয়তির এইরূপ সমাপ্তি হয় কি ? কোন্ দিন কোন্ মনুষ্য পূর্ণতা পাইয়াছে ? বয়োবৃদ্ধি বা শিক্ষার গুণে, ইহ জীবনে কোন্ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হইয়াছে ? কোন্ দিন কে অনুভব করিয়াছে বা বলিয়াছে যে, তাহার জ্ঞান, ভাব বা ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণ চরিতার্থতা হইয়াছে ? জীবন-পথে মানুষ চিরকাল শিশু, সকলেই এ পথের আরম্ভ দেখিতেছে, অন্ত কোথায়, জানে না। বরং মানুষ যতই আত্মজ্ঞান লাভ করে, যতই বাহির ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করে, ততই বর্ত্তমান অপেক্ষা ভাবী জীবনের উপরে দৃষ্টি ও নির্ভর অধিক করিয়া থাকে। ইহ জীবনে, মানবাত্মার অনন্ত রত্ন বা অনন্ত আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্রও চরিতার্থতা হয় না। প্রেমিক হও, প্রেমস্পৃহা কেবলই বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতেই গৌরাঙ্গ দেব নীলাচলে যাইয়া, প্রেমের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সমুদ্র-তরঙ্গে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। জ্ঞানী হও, জ্ঞানতৃষ্ণা কেবলই বৃদ্ধি পাইবে। পৃথিবীর জ্ঞানীদিগের যিনি পূজ্য, সেই নিউটন বলিয়াছিলেন, 'হায়, আমি বালকের মত

বেলাভূমে উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞান-সমুদ্র আমার পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে!" বিশ বৎসর বা পঞ্চাশ বৎসরে মানুষের ইচ্ছার নিবৃত্তি, বালকের কথা। পুরাতন কালে গমন কর; ঐ দেখ, দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষ ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া বলিতেছেন,—"হায়, পৃথিবী যে ফুরাইয়া গেল, আর কি জয় করিব!" একটী মানবাত্মার মূল্য সমগ্র জড়-সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক। জড় ব্রহ্মাণ্ডও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ভাই, আমি থাকিবই থাকিব।

আমি যে থাকিব, তাহার তৃতীয় প্রমাণ এই,—আমার কর্ত্তব্য অনন্ত, আমার দায়ীত্ব অনন্ত। এই জীবনের বিশ বা পঞ্চাশ বৎসরে আমার কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। আমি অনেক সৎকার্য্য করিয়াও ফল পাই না, বা উৎপীড়িত হই। আমি রাশি রাশি কুকার্য্য করিয়াও অনাহত থাকি। এ জীবনেই যদি শেষ, মরিলেই যদি সকল ফুরাইল, তবে সংসারে ন্যায় থাকিল না। দেখ ভাই, পরকাল পরমেশ্বর না মান, ন্যায় নামে একটা পদার্থ আছে, মান তো? ন্যায় ছাড়া সৃষ্টি কোন্ সুবুদ্ধি কল্পনা করিতে পারে? ভাব দেখি,—পরিশ্রমের পুরস্কার নাই, অনিয়মের ফলভোগ নাই, আঘাতের প্রতিঘাত নাই, অত্যাচারের প্রতিশোধ নাই, অথচ জগৎ আছে, জগৎ-কার্য্য চলিতেছে; এরূপ একটা সংসার, এমন একটা সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি মানুষের ভাবনার অতীত। অনেক স্থলে জগৎ-কার্য্যের রহস্য ভেদ করিতে পারি না বটে, কিন্তু ভাই, তুমি আমি বিশ্বাস করি, সকল মানুষই বিশ্বাস করে যে,

সংসার ন্যায়ে চালিত, জগতে ন্যায়ের রাজত্ব। সত্য সত্যই ভাই, সংসারের যিনি বিধাতা, তিনি পূর্ণ ন্যায়বান্। মরিলেই যদি সকল ফুরাইল, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল বিধানগুলি পণ্ড হইয়া গেল। এও কি সম্ভব? তাই বলি ভাই, আমি মরিব, আর উড়িয়া যাইব না।

তবে কি আমি মরিয়া স্বর্গে যাইব? কোথায় স্বর্গ? অতি-দূরে—মাথার উপরে, ঐ মেঘ, ঐ বায়ু, ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য ও অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে, তাহার উপরে কি স্বর্গ? ছি ছি! বোকার মত কথা কহিতেছি। এত পড়িলাম, এত শুনি-লাম, তথাপি কি শূন্যকে স্বর্গ মনে করিব? না, স্বর্গ মাথার উপরে নহে। ছেলে বেলার সেই স্বর্গ, সেই মন্দাকিনী, সেই পারি-জাত পুষ্প কোন দেশে নাই; উহা কেউ কখনও দেখে নাই, উহা কবির কল্পনাতে জন্মেছিল, কল্পনাতেই মিশে আছে। সে স্বর্গ আকাশকুসুম, সেরূপ স্বর্গ কখনও পাইব না।

হায়! তবে কি আমার স্বর্গে যাওয়া হবে না? বৃথা মানুষ হইয়াছিলাম, অনর্থক এই জীবনের ভার বহন করিতেছি। তবে কি আমার স্বর্গে যাওয়া হইবে না? হৃদয়, তুমি আশ্বস্ত হও, আমি স্বর্গে যাইব—স্বর্গ পাইব। কোথায় যাইব? পাঠশালা ছাড়িয়া চতুষ্পাঠীতে যাইব, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে যাইব। এই স্থূল দেহ ও স্থূল সংসার ছাড়িয়া, সূক্ষ্ম ও উন্নত লোকে যাইব। লোকে বলে, সূক্ষ্ম শরীর, আমি তাহাই পাইব। আমি নিশ্চয়ই উন্নত লোকের অধিবাসী হইব। (১)

(১) মরণান্তে শরীর-ধারণ-কথাতে কোন কোন লোকের আপত্তি

আমি পাপী, আমার পাপরাশি সঙ্গে যাইবে, আমার কর্ম্ম-ফল আমাকে ছাড়িবে না, তাহা জানি। কিন্তু পৃথিবীতে থাকিলে, এখানকার নীচতর জ্বালা—নিকৃষ্ট পাপে আমাকে ধরিত। সে লোকে, তাহাতে আর আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তবেইত ভাই,আমার পাপের নৌকা আর নূতন রূপে বোঝাই হইবে না। পুরাতন পাপ পাত্র অভাবে, পুরাতন আগুন ইন্ধন অভাবে নিবিয়া যাইবে; আমি ভব-যন্ত্রণা এড়াইব। আহা, আমার কি সৌভাগ্য, আমি স্বর্গে যাইব! ধন্য পরমেশ্বর, আমি মহাপাপী হইয়াও স্বর্গে যাইব!!

হইতে পারে। কিন্তু আপত্তি করিয়া কি হইবে? পরমাত্মা পূর্ণ, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। পরমাত্মা নিরবলম্ব থাকিতে পারেন। পরমাত্মার জ্ঞানে জগৎসৃষ্টি, এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎকার্য্য পরিচালিত হয়। পরমাত্মার অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব। কিন্তু জীবাত্মা ক্ষুদ্র ও পরিমিত শক্তিবিশিষ্ট। পরিমিত বলিলেই, উহা স্থান বিশেষ, পাত্র-বিশেষ অথবা পরিমাণ বিশেষে আবদ্ধ মনে করিতে হইবে। জীবাত্মার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা নিরবলম্ব থাকিতে, বা যে প্রকারেরই হউক, ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে, এরূপ ধারণাই হয় না। পরিমিত অথচ ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট আত্মাও দেহাবচ্ছিন্ন কল্পনা করা যায় না। কেবল ইহাই নহে। সূক্ষ্ম শরীর-ধারণের শাস্ত্রিক, ঐতিহাসিক এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—শান্তি কোথা আছে ভাই ?

জীবনের পথে, এই সংসার-বিদেশে কত রোগ, কত শোক, কত ভয়, আর কত অত্যাচার—অনন্ত দুঃখ ! রৌদ্রের প্রখর তাপ, বর্ষার প্রবলধারা পতঙ্গের প্রাণে বড় ক্লেশ দান করে। পতঙ্গ পরিশ্রম করিতে চায় না, বহন করিতে পারে না ; পরিশ্রমের যে আনন্দ, সহিষ্ণুতায় যে সুখ, তাহা পতঙ্গ জানে না। পতঙ্গ-প্রকৃতি সুখাভিলাষী ব্যক্তিও কাল্পনিক সুখের জন্য নিয়ত আকুল ; তাই তাহার অবোধ চিত্ত সংসার-সংগ্রামে—রোগ-শোকের তাড়নায় মুহমান হইয়া পড়ে। সংসার-সুখের সাধক নিয়তই হাহাকার করিয়া বলিয়া থাকে—"হায় হায়, এ সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, সংসারে কেবলই দুঃখ !"

জ্ঞানের উপাসক কি বলিতেছেন ? জ্ঞানী বলিতেছেন,—"সংসারে সুখ আছে, দুঃখও আছে। জগৎ কেবল সুখের ভাণ্ডার নয়, কেবল দুঃখের শ্মশানও নয়। দুঃখ যাহাকে বল, সে সুখের অন্তরায় ; সুখ যাহাকে বল, সে কেবল দুঃখের পূর্ব্ব সূচনা। উহার একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব, একের গভীরতায় অপরের তীব্রতা অনুভূত হয়। এ জগতে সুখও আছে, দুঃখও আছে ; সংসারে সুখভোগ অনন্ত, দুঃখও অপরিহার্য্য।"

এক দিন আমিও ঐ কথা বলিতাম। যখন কেবল জ্ঞান-

রাজ্যে পর্যটন করিয়া, আপনার চিন্তাতে আপনি বিভোর থাকিতাম, যখন কেবল কার্য্যকারণ ও ফলাফল-গণনা অন্তর-রাজ্যের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তখন পৃথিবীর হর্ষ-বিষাদ, উত্থান-পতন ও সংযোগ-বিয়োগের পর্য্যায় দেখিয়া, আমিও ভাবিতাম, আমিও বলিতাম,—"এ জগৎ সুখদুঃখের ক্রীড়া-ভূমি, জগতে সুখও অনন্ত, দুঃখও অসীম—অপরিহার্য্য।"

এখন আর আমার প্রাণ সে কথা বলিতে চাহেনা। এখন এক অভিনব রাজ্যে আসিয়াছি। চক্ষু দেখিতেছে নূতন দৃশ্য, কর্ণ শুনিতেছে নূতন ভাষা; এখানে সকলই নূতন। এখন আমার চিত্ত বলে,—জগত আনন্দধাম, জীবন কেবলই সুখের জন্য। এখন দেখি, জগতে কেবল শান্তি, শান্তি, কেবলই শান্তি। যত দিন মানুষ কেবল জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে, তত দিন এ জীবনকে কেবল সুখদুঃখের অভিনয় স্থলই দেখিতে পায়। কিন্তু একবার ভক্তিমার্গে উঠিলে, একবার জ্ঞান-চক্ষুতে প্রেমের অঞ্জন পড়িলে, জীব সে কথা বিশ্বাস করেনা, ঐ যুক্তি মানে না, ঐ কথা আর বলে না। ভক্ত দেখিতে পায়, জীবনপথে দুঃখ যন্ত্রণা অপরাজেয় নহে। দেখ ভাই, দুঃখযন্ত্রণা কেবল মায়াতে একবার মোহের অন্ধকার ঘুচাইতে পারিলে, একবার সেই মন্ত্র, সেই কৌশল শিক্ষা করিতে পারিলে, পৃথিবীর দুঃখযন্ত্রণা মানুষের প্রাণ স্পর্শও করিতে পারে না।

সে মন্ত্র কি—সে কৌশল কি? সে কৌশলের কথা বলিতে পারি বটে; কিন্তু ভাই, সে কৌশল সাধিতে হয়,

কেবল শুনিলে বা বলিলে হয় না। সে কৌশলের কথা বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু সে কৌশল সাধিতে পারি নাই বলিয়া, জীবনের দুঃখ ঘুচে নাই। সে কৌশল বড় সহজ, কত বার বলিয়াছি, কত লোককে শুনাইয়াছি। আজও একবার সে কৌশলের কথা বলি।

তুমি আমি সকলেই সুখের প্রয়াসী। প্রাণ কেবল সুখ চায়, কেবলই শান্তি চায়। কিন্তু তুমি বা আমি এ জীবনে কখন সুখী হইয়াছি? যখন আপনাকে ভুলিয়াছি, তখনই সুখী হইয়াছি। একটুক চিন্তা করিয়া দেখ, আত্ম-বিস্মৃত হইলেই লোক সুখী হয়। পুত্র-মুখ-দর্শনে মায়ের প্রাণে বড় সুখ হয়,—কেন? না, পুত্রের মত প্রিয় পদার্থ পাইয়া মায়ের প্রাণ যত আত্মবিস্মৃত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সন্দেশটী হাতে পাইলে, শিশু আপনাকে ভুলিয়া যায়; তখন শিশুর প্রাণ বড় সুখী। রূপের পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া বিলাসী সুখী, শৌণ্ডিকালয়ে আত্ম-বিক্রয় করিয়া মাতাল সুখী; আবার পরমুখে আত্মবিক্রয় করিয়া যশার্থী সুখী; পরহিতে আত্ম বিস্মৃতি হইয়া সাধু সুখী। কি উন্নত সুখ, কি ইতর সুখ, সকলেরই মূলে আত্মবিস্মৃতি। আত্মগরিমায় যে সুখ, তাহারও মূলে আত্মবিস্মৃতি; কেননা, অহঙ্কারের মত এমন আত্মবিস্মৃতি আর কি আছে? যাহাকে নিয়া যে পরিমাণে আত্মবিস্মৃতি, তাহাকে নিয়া সেই পরিমাণে সুখ। ঐ দেখ ভাই, রুগ্ন সন্তানের জন্য পরিশ্রম, জাগরণ বা উপবাস করিতে আত্মবিস্মৃত জননীর

দুঃখানুভব নাই। ঐ দেখ, রূপমোহে যে আত্মবিস্মৃত, সর্প-পুচ্ছ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে তাহার ভয় বা দুঃখ নাই। জন্মভূমির জন্য যে আত্মবিস্মৃত, রণ-ক্ষেত্রে শত তরবার প্রহারেও তাহার কত সুখ! তবে ভাই জানিয়া রাখ যে, আপনাকে ভুলিতে পারিলেই, পৃথিবীর দুঃখযন্ত্রণাকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

কিন্তু ভাই, আর এক কথা আছে। যাহাকে লইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইবে, সে যদি বঞ্চনা করে, তবে যে দুঃখের বেগ দ্বিগুণ হইবে। তাই বলি ভাই, যত কাল অসত্যের জন্য, অসার পদার্থের জন্য আত্মবিস্মৃত হইবে, ততকাল দুঃখের রাজ্যেই থাকিবে, দুঃখকে অতিক্রম কবিতে পারিবে না। যদি চিরদিনের জন্য সুখশান্তি লাভ করিতে চাও, যদি চিরকালের জন্য দুঃখকে পরাজয় করিতে চাও, তাহা হইলে নিত্য ধন, সার ধন, ব্রহ্মধনে মন বাঁধ; তাঁহার তরে আত্ম-বিস্মৃত হও, ব্রহ্মে আত্মোৎসর্গ কর। দেখ ভাই, ইহারই নাম "আমিত্ব বিসর্জ্জন" করা। ঐ কথার আর কোন অর্থ নাই, আর কোন ব্যাখ্যা তোমরা শুনিও না। আবার বলি ভাই, ধন, জন, রূপ ও যশের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর, তিনি অক্ষয় কবচ রূপে, অপরাজেয় দুর্গরূপে তোমাকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন।

ব্রহ্মের জন্য আত্মোৎসর্গ কেন করিবে না ভাই? ভগবানের প্রেমে আত্মবিস্মৃত কেন হইবে না ভাই? ব্রহ্ম কি তোমার কেহ নন? তিনি কি তোমাকে সুখী করিতে পারেন

না? তুমি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মস্তকের স্বেদ ভূমিতে ফেলিয়া, নিজের জন্য যে অর্থ উপার্জ্জন কর, একজন অপরিচিত লোক অনাহারে তোমার দ্বারে আসিলে, সেই অর্থ তাহার জন্য ব্যয় করিয়া, তাহাকে আহার দান করিয়া, তাহার জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, তুমি সুখী হইয়া থাক। আর ব্রহ্মের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইলে কি তোমার সুখ হইবে না; তোমার জীবনপথে, চলিবার সময়ে, জগৎকার্য্যের প্রয়োজনে—সুতরাং ভগবানের ইচ্ছাতে যদি তোমার ধনক্ষয় হয়, তুমি দরিদ্র হও, তাহাতে তুমি সুখী হইবে না কেন? তাহাতে তুমি ম্রিয়মাণ হইবে কেন?

তোমার কোন প্রতিবেশী তোমাকে ভালবাসিয়া, যদি স্বহস্তে তোমার বৃক্ষের সুপক্ক ফলটী ছিঁড়িয়া লইয়া যায়, তাহাতে তোমার কি সুখ হয় না? তবে মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমার ফলাফল চিন্তা ব্যর্থ করেন বলিয়া, তোমার আরব্ধ কার্য্যে অভীপ্সিত ফল দেন না বলিয়া, তুমি দুঃখিত হও কেন? দূরদেশ হইতে কোন প্রিয় বন্ধু আসিলে, যদি তোমার প্রিয়তম সন্তানকে সঙ্গে করিয়া কিছু দূরে লইয়া যান, তুমি তখন তাহার বিচ্ছেদে কাতর হও না, বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া সুখী হও। পরমেশ্বর কিছুকালের জন্য তোমার পুত্রকে তোমা হইতে দূরে লইয়া গেলে, তোমার পুত্রের মৃত্যু হইলে, তুমি ব্যাকুল হও কেন? সে স্থলে ব্রহ্মের জন্য আত্মবিস্মৃত হইতে পার না কেন?

সত্য কথা বলিলে ভাই, রাগ করিও না। ফল কথা, তোমার আমার সকলেরই এক অবস্থা। আজিও আমরা উজ্জ্বলরূপে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। আজিও পরলোক ও পরমার্থে আমাদিগের অলড় আস্থা জন্মে নাই। তাই আমরা এক এক বার প্রকৃতিস্থ হই, আর এক এক বার মায়াবশে ক্রন্দন করি; তাই এক একবার আনন্দের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠি, আর এক একবার নিরানন্দে মগ্ন হইয়া হাহাকার করিয়া থাকি। হায়! যদি পরব্রহ্মকে বিশ্বাস করিতে পারিতাম, যদি সেই পরম পদার্থকে জানিতাম, যদি সেই পরমাত্মীয়কে চিনিতাম, তাহা হইলে কি আর রোগ শোক, দুঃখ বা দারিদ্র্য আমাদিগকে আকুল করিতে পারিত? কখনই পারিত না।

ভক্তি কি, আমরা জানিনা, প্রেমমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই নাই। আত্ম-বিস্মৃতির কৌশল আমরা জানি না; সে কৌশল আমরা জানিতে পারিলেও, তাহা সাধন করি নাই। তাই আমরা সংসারের ক্রীড়া-পুতুল, ক্ষণে হাসি, আর ক্ষণে কাঁদি। হায়,কবে সে দিন আসিবে, কবে প্রেমময়কে চিনিব, কবে তাঁহাতে প্রাণ উৎসর্গ করিব, কবে তাঁহার জন্য আপনাকে ভুলিয়া অক্ষয় কবচে আত্মরক্ষা করিব? হায়, কবে সে দিন হবে, কবে তাঁহার ইচ্ছাতে ইচ্ছার মিলন করিয়া, ভবযন্ত্রনা এড়াইব। হায়, কবে মানব জন্ম সফল হবে। ভাই, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায়—মায়ার খেলায় মুগ্ধ হইয়া, অনর্থক ক্রন্দন করিওনা,

তাঁহার জন্য ক্রন্দন কর; প্রেমময়ের প্রেম ভিক্ষা করিয়া অশ্রুপাত কর, চির শান্তি পাইবে, নিত্যানন্দ-লাভে অধিকারী হইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন—মুক্তি কি ? তা পাই কোথা ?

সকলেই বলে, "মুক্তি চাই।" কিন্তু মুক্তি কাহাকে বলে ? আর তা পাইই বা কোথায় ? মুক্তি কি কোন গাছের ফল ? তাহাতেই কি লোকে বলে, মোক্ষফল ? সে ফল কোথায় মিলে ? সে বৃক্ষ কোন্ দেশে জন্মে ভাই ?

আমি অজ্ঞান, আমার শাস্ত্র-জ্ঞান নাই। শাস্ত্রের কথা, জটিল কথা আমি একেবারেই বুঝি না। ঘটাকাশ বা ঘটের নাশ প্রভৃতি কথাতে আমার দন্তস্ফুট হয় না। ঘটের নাশে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের যাহা ঘটে, তাহাই যদি মুক্তি, তবে আর পাইলাম কি ? তাহা হইলে যে একেবারেই গেলাম !

একদিন পণ্ডিতের মুখে পরমার্থ-কথা শুনিতেছিলাম। পণ্ডিত বলিলেন, মুক্তি চারি প্রকার যথা,—সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। পণ্ডিত এ সকল কথার নানা রূপ ব্যাখ্যা করিলেন। আমি কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার প্রাণ মুক্তির জন্য, মোক্ষফলের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। যদি মোক্ষফল সামান্য জিনিস হইত, সর্করা, সন্দেশ বা গাজা-

রের মেওয়ার মত মিষ্ট ফলও হইত, অথবা যদি স্বর্ণ, রৌপ্য বা হীরকাদির মত মূল্যবান পদার্থও হইত, তাহা হইলেও আমি 'মোক্ষফল মোক্ষফল' বলিয়া ভাবিতাম না। কিন্তু মোক্ষফল না হইলে যে আমার দিন চলেনা, সে ফল লাভের জন্য যে আমার মন কাঁদে! তাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া অবধি, সালোক্য ও সাযুজ্য প্রভৃতি কথাই কেবল ভাবিতে লাগিলাম; দিবানিশি আমার ঐ এক ভাবনা—সালোক্য কাহাকে বলে, সাযুজ্য কিরূপ? হায়! মোক্ষফল যদি এমন জিনিস, যাহার নাম শুনিয়া বুঝিতে পারি না, তবে তাহা কোথায় পাইব? কিরূপে পাইব? আর তাহার জন্য আমার প্রাণই বা এত কাতর হয় কেন?

এইরূপ ভাবনাযুক্ত চিত্তে এক দিন গভীর রাত্রিতে আমি দেখিতে পাইলাম, স্বর্গ হইতে এক দিব্য পুরুষ নামিয়া আসিয়া, তাঁহার পবিত্র স্পর্শ ও দিব্যজ্ঞান-কৌশল দ্বারা আমার চক্ষু দুইটী ভিতরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। যে দিকে অন্ধকার ছিল, দিব্য পুরুষের কৃপায় সেই দিকেই আমি পরম রমণীয় অভিনব দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সুবিমল প্রেম-সূর্য্য স্বর্গীয় কিরণ বিস্তার করিয়া, অন্তরাকাশে উদিত হইতেছেন; তাঁহার সুমধুর অমৃতবর্ষী কিরণ-স্পর্শে আমার চিত্তক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। জীবনে এমন আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। অবাক হইয়া দিব্য পুরুষের দিকে চাহিয়া থাকিলে, তিনি আমাকে

কহিলেন, "কি দেখিতেছ ? জীবনের এই অবস্থাকে সালোক্য অবস্থা বলে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে একই লোকে অবস্থিতি করেন, এইরূপ অবস্থাতে তাহাই দেখা যায় ; পরমাত্মা যে স্বর্গে আছেন, আর জীবাত্মা যে পৃথিবীতে তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে, সেই ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইয়া যায়।"

এইরূপ আনন্দময় অবস্থাতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে দেখিলাম, চিত্ত-ভূমিতে এক সুন্দর অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে। সূর্য্যকিরণ আরও উজ্জ্বল হইলে, আমার দৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর হইল, তখন দেখিলাম, যেন সেই প্রেম-সূর্য্যের প্রকৃতি ও আমার চিত্তভূমির প্রকৃতিতে চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমার চিত্তভূমি মৃত্তিকাময় এবং বহুনিম্নে অবস্থিত হইলেও, যেন অনন্ত রশ্মিজাল-পরিশোভিত উন্নত প্রদেশ-বিহারী সুশোভন প্রেম-সূর্য্যের সঙ্গে একরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম ; এবং সেই অনুভূতি বলেই যেন চিত্তভূমিতে নবোদ্গত অঙ্কুর ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই আশ্চর্য্যজনক অবস্থাকে রহস্যময় মনে করিয়া, দিব্য পুরুষের দিকে চাহিলে, তিনি বলিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছনা ? ইহারই নাম সারূপ্য। ভগবানের কৃপাতে আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই, পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবাত্মা যে পরমাত্মার প্রকৃতিতে গঠিত, পরমাত্মার অনুসরণ করাই যে জীবাত্মার সৃষ্টির নিয়তি বা লক্ষ্য, জীবনের এই অবস্থাতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়।"

দিব্য পুরুষের কথা শুনিতে শুনিতে দেখিলাম, চিত্তভূমির সেই অঙ্কুর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া, সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইল; এবং সেই বৃক্ষে সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইল। সেই পুষ্পের স্বর্গীয় সৌরভে আমি প্রমত্ত হইয়া উঠিলাম, এবং আপনার প্রাণের আনন্দাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। দিব্য পুরুষ তখন আমাকে কহিলেন,—"দেখ, তোমার এখন যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাকে সাযুজ্য অবস্থা বলে। জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে যে অভেদ্য যোগ রহিয়াছে, জীবাত্মার উপর যে পরমাত্মা নিত্য কার্য্যশীল, এই অবস্থাতে মানুষ তাহাই বুঝিতে পারে।"

দিব্য পুরুষের কথা শুনিতে শুনিতে, আমার চিত্তে অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত ভাবের আবির্ভাব হইল, শারদীয়া পূর্ণিমা নিশিতে ঘন-বিরহিত আকাশের যেমন প্রশান্ত ভাব, আমার চিত্তেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। চিত্তভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি, যে রমণীয় বৃক্ষের পুষ্পের সুগন্ধে আমি প্রমত্ত হইয়াছিলাম, সেই বৃক্ষে পুষ্পাভ্যন্তরে অপূর্ব্ব ফল জন্মিয়াছে! দেখিতে দেখিতে ফলের বৃন্ত পুষ্ট হইয়া উঠিল, এবং পুষ্প পড়িয়া গেল। দিব্য পুরুষ সেই পুষ্পের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এতক্ষণে তোমার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইল। পরমাত্মা বা প্রেম-সূর্য্যের অভ্যুদয়ে তোমার চিত্তভূমির অজ্ঞানান্ধকার বিদূরীত হইয়াছিল; প্রেম সূর্য্যেরই প্রভাবে তোমার

চিত্তক্ষেত্রে প্রেমের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল; তাঁহারই কৃপা-কৌশলে সেই অঙ্কুর বৃক্ষ হইয়া, তাহাতে ভক্তি-পুষ্পের উৎপত্তি, এবং তাহাতেই মুক্তিফল-প্রসূত হইল। এই মোক্ষফল চিরস্থায়ী; উহা এইরূপেই তোমার চিত্তক্ষেত্র সুশোভিত ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া রাখিবে।"

দিব্য পুরুষের মুখের দিকে সরল ও সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তিনি আবার কহিতে লাগিলেন,—"যাহা বলিলাম, বোধ হইতেছে, যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেনা। মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যাহারা মনে করে, পরমেশ্বর উন্নত লোকে আছেন, এবং মানুষ নিকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছে, তাহারাই মনে করে যে, সাধুতা ও সৎকার্য্য সাধন করিয়া, এই লোক হইতে যাইয়া, সেই উন্নত লোকে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে, বা কজ্জল-নয়না অপ্সরাদিগের সহবাসে চির সুখে কাল যাপন করিবে। এরূপ যাহাদিগের বিশ্বাস, তাহারা মুক্তিতত্ত্ব হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। বাসনার নিবৃত্তি দূরে থাকুক, তাহারা পার্থিব বাসনা লইয়াই, পরলোকেও সুখী হইবার কল্পনা পোষণ করিতেছে। আর যাহারা মানবজীবনের উন্নত সুখের স্বাদ পায়নাই, তাঁহারা মনে করে, একেবারে আত্মনাশ হইলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে। তাই তাহারা ঘটা-বচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, মৃত্যুর পরে অন্য কোন পদার্থে আপনার বিসর্জ্জন বা বিলোপকেই, মুক্তি বা ভবযন্ত্রণার অবসান মনে করিয়া থাকে। তাহারাও মুক্তিতত্ত্বের কিছুই অবগত নহে।

জীবাত্মার স্বভাবের উন্নতি বা বিকাশ এবং বিকৃতির নিরাকরণেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। পুষ্পে যদি কীট দংশন করে, পুষ্পের সৌন্দর্য্য থাকে না। পুষ্প যদি প্রস্ফুটিত হইবার সুবিধা না পায়, পুষ্প নষ্ট হইয়া যায়। পুষ্প হইতে কীট দূর করিলে, এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার সুবিধা করিয়া দিলেই, পুষ্প সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে। কু প্রবৃত্তি ও কু অভ্যাস হইতে মুক্ত করিলে, এবং সৎপ্রবৃত্তির সমুন্নতি করিবার সুবিধা করিয়া দিলেই, মানবাত্মার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু পারলৌকিক ইন্দ্রিয় সুখের প্রত্যাশা, বা আত্মবিনাশ করিবার উপায় কল্পনা করিলে, জীবাত্মা মুক্তিপথের পথিকই হইতে পারে না।

"প্রকৃতরূপে ধর্ম্মপিপাসু হইয়া, মানুষ যখন দেখিতে পায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একলোকে অবস্থিতি করিতেছেন, যখন দেখিতে পায় যে, পরমাত্মার প্রকৃতিতেই জীবাত্মা গঠিত হইয়াছে, যখন দেখিতে পায় যে, পরমাত্মার যোগে বা অনুপ্রাণনাতেই জীবাত্মা মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতেছে, তখনই সে মোক্ষপথে চলিতেছে। এইরূপে মোক্ষপথে চলিতে চলিতে, যখন তাহার ইচ্ছা পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে অভিন্ন দেখিতে পায়, তখনই সে মোক্ষফল লাভ করে। এই ফল হইতে আর সে কিছুতেই বঞ্চিত হয় না। এই অচ্যুত অবস্থাতে পরমাত্মার কৃপাতে, সে কেবল পূর্ণ মঙ্গলের দিকেই যাইতে থাকে; ইহারই নাম মুক্তি। মুক্ত অবস্থায়ই জীব নিষ্কাম

ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্রীড়ার জন্য ক্রীড়া করে, অথচ তাহাতেই পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকে, নিষ্কাম ধর্ম্মের অধিকারী মুক্ত ব্যক্তিরাও সেইরূপ নিত্য ও নির্ম্মল সুখের অধিকারী।"

জাতিভেদ ও তাহার ফল।

বিধাতার সৃষ্টিতে, কি জড়জগতে, কি মানব-সমাজে, সর্ব্বত্রই অসীম বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। একটী জড়পদার্থ আর একটী জড়পদার্থের মত নহে, একজন মানুষের দেহ বা মনও আর একজন মানুষের দেহ বা মনের মত নহে। এই বিচিত্রতা সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত ইচ্ছাই প্রকাশ করিতেছে। এই অসীম বিচিত্রতার স্রষ্টা যেমন এক, ইহার লক্ষ্যও সেইরূপ এক। ইহার লক্ষ্য জগতের উন্নতি, জীবের সদগতি। জড়জগতের পদার্থ সকল বিভিন্নরূপী ও ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়াও, পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আর সকলে মিলিয়া কেন্দ্রাভিমুখেই গমন করিতে চায়। জড়ের এই দ্বিবিধ গতিকে যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ বলা যায়। মানব জগতেও বিধাতার সেই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। ভিন্ন রূপ বিশিষ্ট এবং ভিন্ন অব-স্থাপন্ন হইয়াও, মানুষ পরস্পরের প্রাণমন আকর্ষণ করে, এবং সকলেই এক হইয়া পরমাত্মা বা প্রাণ-রাজ্যের কেন্দ্রের দিকে যাইতে চাহে। মানবজগতের এই দ্বিবিধ গতিকে প্রেম ও ভক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে

মঙ্গলময় বিধাতার সৃষ্টির লক্ষ্যই মঙ্গল, আর সৃষ্টির এই বিচিত্রতা, পূর্ণ মঙ্গল সাধনেরই উপকরণ; সুতরাং অসীম বৈচিত্র সত্ত্বেও জড়ে জড়ে বা মানুষে মানুষে স্বভাবতঃ বিরোধ নাই। যাহা আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তাহাও লক্ষ্যসাধনে বিরোধী নহে। সুতরাং উভয়ের মূল্যই সমান, কেহই কাহা অপেক্ষা হীন নহে। ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই লক্ষ্য রোগ-নিবারণ; সুতরাং তিক্ত হইয়াও ঔষধ যেরূপ উপকারী, সুস্বাদু হইয়াও পথ্য সেইরূপ উপকারী; কেহ কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। একজন রাজনীতিজ্ঞ আর একজন কৃষক আপাততঃ দেখিতে অনেক বিভিন্ন হইলেও, দেশের পক্ষে, রাজ্যের পক্ষে উভয়েই সমান মূল্যবান। কৃষকের দ্বারা শস্যোৎপাদন হইয়া যদি রাজ্য বাঁচে, তবেইত রাজ্য আর রাজনীতি? তেমনই আবার রাজনীতি-কৌশলে দেশ রক্ষিত হইয়া, কৃষির উন্নতি ও কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইলেই ত কৃষকের জীবন ও কার্য্য চলে? অতএব কৃষকও যেমন, রাজনীতিজ্ঞও তেমন; কেহ সাঁত, আর কেহ পাঁচ নহে।

মানুষ যখন ভ্রমবুদ্ধিবশে অহঙ্কৃত বা স্বার্থান্ধ হয়, তখনই আপনাকে শ্রেষ্ঠ, পরকে নিকৃষ্ট, রামকে বড়, আর শ্যামকে ছোট দেখিতে পায়। নতুবা মানুষের পক্ষে মানুষ মাত্রেই সমান প্রেমের পাত্র। যে বিধাতা চরাচর বিশ্বের অধিপতি এবং রাজাধিরাজ হইয়াও, ছোট বড় সকল মানুষকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, সকল মানুষই তাঁহার সন্তান, এবং তাঁহার ভাবে

ভাবাপন্ন। বিধাতা যেন এক হস্ত বিস্তার করিয়া, মানবজাতিকে প্রেমের ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, আর এক হস্তে ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া, মানব-সমাজকে নিয়মিত করিতেছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রেমও ন্যায়ে দূরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবান পূর্ণ প্রেমময়। যেখানে পূর্ণ প্রেম, সেখানেই ন্যায় বর্ত্তমান। রামকে তিনি পূর্ণরূপে প্রেম করেন, শ্যামকেও তিনি পূর্ণরূপে প্রেম করেন। অতএব রাম ও শ্যাম উভয়েই তাঁহার রাজ্যে সুখও সুযোগ তুল্যরূপে পাইবার অধিকারী। মানুষ বিধাতার নিকটে যে অধিকার পাইয়াছে, মানুষের নিকটেও সেই অধিকার কেন না পাইবে? সকল মানুষই হৃদয়মন লইয়া জন্মিয়াছে, সকল মানুষেরই চিত্তবৃত্তি সমূহ অনন্ত উন্নতিশীল, সকল মানুষই সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় সমানরূপে অধিকারী। ভগবানের সন্তান, এবং সমান অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া, মানুষ সকলেই সমান; কেহ সাত, আর কেহ পাঁচ নহে। আজ যাহাকে সাত মনে করিতেছ, কাল আবার সে ছোট হইতে পারে। কেননা, পাঁচ যে কাল নয় হইবে না, বিধাতার রাজ্যে এমন নিষেধ-বিধি নাই। মানুষের সমান অধিকারের এইরূপ জ্ঞানের নামই সাম্য। ভক্তি এই সাম্য-জ্ঞানের কেন্দ্র, আর প্রেম বা লোকপ্রীতি ইহার পারধি। অতএব প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এই সাম্যবাদ একটা সামাজিক সিদ্ধান্ত বা মত নহে, ইহা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গস্বরূপ। এই সাম্যবাদের মর্য্যাদা যাহারা রক্ষা করেনা, এই সাম্যবাদের যাহারা বিরুদ্ধাচার

করে, তাহারা ভক্তি ও প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাঁহারা বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মের আদর্শ হইতে অনেক নিম্নেই অবস্থিতি করিতেছে।

সাম্যবাদের এরূপ অর্থ নহে যে, সমাজ-মধ্যে মানুষের সম্ভ্রম বা আধিপত্যের তারতম্য থাকিবে না। এরূপ তারতম্য অবশ্যই থাকিবে। গুণ, জ্ঞান ও ক্ষমতানুসারে মানুষে মানুষে ইতর বিশেষ হইতেই হইবে। একজন পূতচরিত্র পরহিতৈষী ব্যক্তি একজন দুষ্কার্য্যশীল পাষণ্ড লোক হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন; একজন বিজ্ঞানবিদ্ মহাপণ্ডিত একজন গণ্ডমূর্খ অপেক্ষা শতগুণে সম্মানিত হইবেন; আর একজন কর্ম্মঠ ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিও একজন অলস ও পরানুগৃহীত ব্যক্তি অপেক্ষা বহু পরিমাণে আদরণীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। এইরূপ তারতম্যের মূলে প্রেম-বিরুদ্ধ বা ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার নাই। যেরূপ বিধি বা ব্যবহার মানুষকে স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তাহাই সাম্যবাদ অর্থাৎ ভক্তি ও প্রীতির বিরোধী। মানব-কুলে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারই এই সকল স্বাভাবিক অধিকার আছে, যথা,—সে ইচ্ছানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে, ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যবসায় করিতে পারিবে, ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিবে, ইচ্ছানুসারে পতি বা পত্নী নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, অবাধে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে, স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ইচ্ছানুসারে দান বা ব্যবহার করিতে পারিবে, যেরূপ

খাদ্য স্বাস্থ্য বা রুচির উপযোগী হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহাকে ভক্তি করিবে বা ভালবাসিবে, তাহারই সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে বা আহার বিহারে সম্মিলিত হইতে পারিবে, ইত্যাদি। এই সকল স্বাভাবিক অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলেই, সাম্যবাদের অর্থাৎ ভক্তি ও প্রীতির বিরুদ্ধাচার করা হয়। কেননা, ভক্তির আশ্রয় ও প্রেমের উৎস ভগবান মানুষ মাত্রকেই এই সকল অধিকার দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, আর এই সকল অধিকারের সদ্ব্যবহার করিয়াই মানুষ শান্তি ও সদ্গতির পথে অগ্রসর হইবে।

ভক্তি ও প্রীতির বিধানে জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একতা বা সাম্য রাজত্ব করিতেছে, অল্পবুদ্ধি ও স্বার্থান্ধ মানুষ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। সুতরাং নানা প্রকারের অসাম্য ও অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে; যাহা একতা ও উদারতা শিক্ষার হেতু, তাহাকেই ভিন্নতা ও বিরোধের কারণ মনে করিতেছে। তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। আমার যদি ধনের প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে তোমাতে ও আমাতে প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক হইত না, দাতা ও গৃহীতার সম্বন্ধ হইত না; তোমার ও আমার মধ্যে পরিচর্য্যা, স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার বিনিময় হইত না। তোমার ও আমার অবস্থার বৈচিত্র্যকে কোথায় একতা ও উদারতা-শিক্ষার, প্রেম ও ভক্তি সাধনের কারণ জ্ঞান করিবে, না, তুমি উহাকেই বিচ্ছেদ ও বৈষম্যের কারণ স্থির করিয়া বসিয়া আছ!

বিচিত্রতা-পূর্ণ সুখের সংসারকে মানুষ কত প্রকারে অসাম্য ও অশান্তি দ্বারা দুঃখময় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজ-মধ্যে প্রধানতঃ আমরা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের অসাম্য দেখিতে পাই যথা—

১। জন্মগত।

২। বংশগত।

৩। দেশগত।

৪। ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ধন, জ্ঞান বা পদগত—এবং

৫। মতগতি;

এই সকল অসাম্যের মধ্যে আমরা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের অসাম্যকেই জাতিভেদ নামে অভিহিত করিলাম। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, জন্ম শব্দের সঙ্গেই জাতি শব্দের প্রকৃত নিকট সম্বন্ধ, ধনগত বা পদগত অসাম্যের সঙ্গে জন্মের কোন সম্পর্ক নাই। আর ধনগত বা পদগত অসাম্য অনিষ্টকারী হইলেও উহা সমাজে স্থায়ী হইতে পারে না। আজ যে পদাতি, কালে সে প্রাড়্‌বিবাক হইতে পারে; আর আজ যে নির্ধন, সময়ে ধনী হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। প্রাড়্‌বিবাকের পুত্রকে প্রাড়্‌বিবাক হইতেই হইবে, আর দরিদ্রের সন্তানকে দরিদ্রই থাকিতে হইবে, এমন কোন বিধি নাই। কিন্তু শিক্ষার গুণে বা অবস্থার পরিবর্ত্তনে, কোনরূপেই জন্মগত, বংশগত বা দেশগত অসাম্যের প্রতিকার হইবার কোন উপায় নাই। একজন রমণী বা তাহার কন্যা চিরকাল রমণীই

থাকিবে, কদাপি পুরুষ-পদ-বাচ্য হইতে পারিবে না; রামের পুত্র বা শ্যামের পৌত্র পুরুষানুক্রমে রাম বা শ্যামের বংশধরই থাকিবে; আর এক দেশের অধিবাসীও দেশত্যাগী না হইলে, অন্য দেশের অধিবাসী বলিয়া কদাপি গণ্য হইতে পারিবে না।

জন্মগত অসাম্য কিরূপে রক্ষিত হইতেছে, তাহাই দেখা যাউক। বিধাতার ইচ্ছাতে, একই দেশে, একই সমাজে, একই পরিবারে একজন জন্মিয়াছে পুরুষ হইয়া, আর একজন জন্মিয়াছে নারী হইয়া। পুরুষের সুখদুঃখ, ভাবচিন্তা, শক্তিসামর্থ্য, দায়ীত্ব বা সত্ত্বের মূল্য নারীর ঐ সকল বিষয়ের মূল্য অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। পুরুষ নারী হইতে বেশী বুঝে না, নারীর অপেক্ষা পুরুষের ভক্তি বা কার্য্যশীলতা অধিক নহে। তবে পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। কিন্তু পুরুষের সাহস, সামর্থ্যের যে মূল্য, নারীর সহিষ্ণুতা বা কোমলতার তদপেক্ষা কম মূল্য নহে। শাস্ত্রে বলে, নারী গৃহলক্ষ্মী, কবিতা বলে, নারী অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী; কিন্তু কার্য্যকালে পুরুষই যেন পদার্থ, আর নারী তাঁহার ছায়া; পুরুষই যেন সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, আর নারী যেন কিছুই নহে। পুরুষ আর নারী যে সমান, পুরুষ অর্দ্ধ এবং নারী অর্দ্ধ একত্র হইলেই যে পূর্ণ এক হয়, তাহা পুরুষ জানে, কিন্তু মূর্খতা ও স্বার্থপরতা তাহাকে ঐ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে দেয় না। তাই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, কৌলিক সম্পত্তি পুরুষ থাকিতে রমণী অধিকার করিতে পারিবে না। নারীকে যে উত্তরাধিকারের একে বারে অনুপযুক্ত মনে করা হইয়াছে, তাহা

নহে। তবে কিনা, ভোগ দখল করিবার জন্য পুরুষকে যখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তখন পুরুষ মধু অভাবে নারী গুড় স্থান পাইবে। বহু বিবাহ বা সামাজিক ব্যভিচার করিয়া পুরুষ বুক ফুলাইয়া চলিতেছে, আর নারী অবলা, তাই পাঁচ বৎসরে বিধবা হইয়াও আজীবন ব্রহ্মচর্য্য লইয়া আছে। সমাজের এই ব্যবস্থা! সপ্তবর্ষ বয়সের সময়ে অর্থলোভী পিতা গণ্ড মূর্খ বা চরিত্রহীন পাষণ্ডের সঙ্গে বালিকার বিবাহ বা বিসর্জ্জন দিয়া রাখিয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বালিকা যখন বুঝিতে পারিল যে, সেই ক্রেতা তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব হইবার উপযুক্ত নহে, তখনও শাস্ত্র বলিবে যে, সেই নরাধমই তাহার বৈধ পতি! নিরপরাধে যদি সে পত্নীকে পরিত্যাগ করে, এক মুষ্টি উদরান্ন দিলেই তাহার অব্যাহতি! আর সে যদি শত অপরাধীও হয়, হৃদয়ের রক্ত দিয়াও সেই বালিকাকে তাহার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দিতেই হইবে!! পুরাতন অধর্ম্ম-শাস্ত্রের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর "সুসভ্য" আসুরিক ব্যবস্থা বা আইন মিলিয়া, এইরূপে পুরুষ ও রমণীর মধ্যে অসাম্য রক্ষা করিতেছে!

কেবল ইহাই নহে। সন্তানের উপরে পুরুষের যত দাবি, বলিতে গেলে, নারীর তদপেক্ষা অধিক। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, অনেক সময়ে সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণ কঠিন হইতে পারে, মাতৃত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ই হইতে পারে না। তথাপি, নারী বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে প্রতিপালন করিতেছে, আসুরিক আইনের বলে পুরুষ সেই কোলের ধন কাড়িয়া

নিয়া, নারীকে উন্মাদিনী বা সংসারেই শ্মশানবাসিনী করিতে পারে! পুরুষ রাজমন্ত্রীর আসনে বসিয়া আছেন, আর নারী "নারী" বলিয়াই রাজমন্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক, রাজপুরুষ নির্ব্বাচনের অধিকারেও বঞ্চিত। এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া, নারী হইল প্রথম, আর পুরুষ হইল সকলের অধম; কিন্তু পুরুষ "পুরুষ" কিনা, তাই বিদ্যাভূষণ নামে পরিচিত হইল! আর নারী "নারী" বলিয়াই উপাধি পাইবার অযোগ্য হইয়া রহিল !!

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আর একটী গুরুতর অসাম্য দেখাইয়াই অন্য কথা পাড়িব। ভক্তি ও প্রেমের অনুমোদিত বিবাহের আদর্শ কি? না, স্বাধীন ভাবে, স্বাধীন প্রেমে নরনারী পরস্পরকে আত্মসমর্পণ এবং পরস্পরের ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হওয়া। কিন্তু বিবাহ-স্থলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, পুরুষের নিকটে নারী যেন কতই হীন। নারীকে উদ্ধার করিবার, নারীকে অনুগ্রহ করিবার এবং নারীর বোঝা বহিবার জন্যই যেন পুরুষ বিবাহ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে; মাতঙ্গের কর্তৃত্বাধীনে যেন কুরঙ্গীকে অর্পণ করা যাইতেছে। সেই জন্যই বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান "কন্যা-সম্প্রদান।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বরের নিকটে যদি কন্যা-সম্প্রদান চলে, তবে কন্যার নিকটে বর-সম্প্রদান চলিবে না কেন? দেশের দোষে বর কিঞ্চিৎ লেখাপড়া বেশী জানেন, হয়তো উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইবেন, এই জন্যই কন্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিতেছ। কিন্তু

কন্যা যে কম লেখাপড়া জানিলেও, গৃহকার্য্য অধিক জানেন, রোগের শুশ্রূষা করিতে, আর শোকে সান্ত্বনা দিতে এবং চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিতে জানেন, এজন্য কি তাঁহার হাতে বর-সম্প্রদান হইতে পারে না ? ভক্তি ও প্রীতির বিনাশক অসাম্য-জ্ঞানই এরূপ না হইবার কারণ।

বিবাহ-বন্ধনে পুরুষ ও রমণী আবদ্ধ হইলেই, পত্নীকে পতির কুল-পদবী গ্রহণ করিতে হইবে। রমণীকে গোত্রান্তরিতা, অর্থাৎ অন্য বংশীয়া হইয়া যাইতে হইবে। এরূপ প্রথা নিতান্তই ন্যায়বিরুদ্ধ নয় কি ? ভৌগলিক উপাধি ভিন্ন আর কোন উপাধিই বংশ-পরম্পরায় চলিতে পারে না। বসু বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র হইলেই, যদি তাহাকে বসু বা বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে হয়, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম বা রায়-বাহাদুরের পুত্র পৌত্রাদিরও সার্ব্বভৌম বা রায়-বাহাদুর হওয়া উচিত। কৌলিক উপাধি অসাম্য ও অন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অন্যায়রূপে পুরুষ যে কৌলিক উপাধি গ্রহণ করিয়াছে, অন্যায়ের উপরে অন্যায় করিয়া, আবার রমণী কেন তাহার সেই পাপের ভাগিনী হইতে যাইবে ? নিজের মাতৃবিয়োগ হইলে, বিবাহিতা রমণী তেরাত্র অশৌচ পালন করিবে, আর পতির মাতৃবিয়োগ হইলে, দশ দিন, পনর দিন বা ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করিবে। কিন্তু পত্নীর মাতৃবিয়োগ হইলে, পতি অশৌচের ধারই ধারিবে না। এরূপ ব্যবস্থা কি প্রেম-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচারণ নহে ? এ জগতে জননীর মত গরীয়সী কে ?

যাঁহার হৃদয়ের রক্তপান করিয়া জীবন ধারণ করা যায়, যাঁহার স্নেহের তুলনা এ জগতে নাই, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য বিনিময় করিলেও, যাঁহার এক বিন্দু স্তন্যের ঋণ পরিশোধ হয় না, তেমন জননীর প্রতি উপেক্ষা, বিবাহ-বন্ধনের খাতিরে তেমন জননীকে অপেক্ষাকৃত "পর" করিয়া দেওয়া কি প্রেমময় পরমেশ্বরের রাজ্যে প্রেমধর্ম্মের ঘোরতর বিরুদ্ধাচার নহে? পুরুষ ও রমণীর জীবনের অধিকার বিষয়ে জ্ঞানাভাব, এবং পশুবলে পরাক্রান্ত পুরুষজাতির স্বার্থপরতা-জনিত অহঙ্কারই এই দারুণ অসাম্যের হেতু।

নারীজাতির উত্তরাধিকার বিষয়ে লোকে নানা প্রকারের আপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকে। বিবাহ-বন্ধন-বশতঃ পারিবারিক অশান্তি ও সম্পত্তির বহু বিভাগ-জনিত সমাজের দরিদ্রতা-বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক কথাই তাহারা কহিয়া থাকে। তাহারা কিন্তু প্রেম ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না। পুত্রবধূ আসিয়া যদি পুত্রের সঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারে, জামাতা আসিয়া কন্যার সঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করিলে ক্ষতি কি? যদি বহু বিভাগে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়াই এত অপ্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে দেশান্তরে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তদনুসারে এ দেশেও কৌলিক সম্পত্তি একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই নিজস্ব হয় না কেন? তদ্রূপ করিতে গেলে, এদেশীয় শাস্ত্রকারেরা ও পিতার জ্যেষ্ঠেতর পুত্রেরা কি অন্যায় হইতেছে বলিয়া ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিবেন না?

নরনারীর সমভাবে উত্তরাধিকারের ইতিহাস কোন দেশেই পাওয়া যায় না। আমাদিগের বিশ্বাস, পুরুষ ও রমণী উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিয়া, উত্তাধিকারের ব্যবস্থা হইলে, জগতের প্রভূত মঙ্গল হইত। পুরুষকে অন্যায়রূপে কুলপদবীর অধিকারী, এবং নারীকে তাহার ছায়ারূপিণী করাতেই, অমূলক অশান্তির বিভীষিকা দেখা গিয়া থাকে। যদি ভ্রাতা এবং ভগিনীকে তুল্য মনে করা যাইত, আর যদি বিবাহের পরে ভগিনী তাহার পতির কৌলিক নামে নামাঙ্কিতা হইয়া "পর" হইয়া না যাইত, তাহা হইলে ভ্রাতুস্পুত্র ও ভাগিনেয় এ উভয়ই সমান "আপনার" বিবেচিত হইত, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

জনসমাজে আজিও পশুবলেরই জয়জয়কার। জ্ঞানবল অতি ক্ষীণ, এবং প্রেমবল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিলেও হয়। বিধাতার মঙ্গল-বিধানে যখন পশুবল খর্ব্ব হইয়া যাইবে, জ্ঞানবল প্রবল ও প্রেম-বল সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন আর পুরুষজাতি নারীজাতিকে এইরূপে নির্য্যাতন করিতে পারিবে না। বিধাতার পিতৃভাব পুরুষ জাতিতে, ও মাতৃভাব নারীজাতিতে পরিব্যক্ত। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সমান অধিকার স্থিরীকৃত হইয়া, এক দিন সাম্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, প্রেম ও ন্যায়ের মহিমা ঘোষিত হইবে।

কিন্তু যতকাল সে সুখের দিন না আসিতেছে, নারীনিগ্রহের বিরাম হইবে না; মানব-সমাজও স্বাভাবিক পদবিক্ষেপে মঙ্গ-

লের পথে, উন্নতির পথে চলিতে পারিবে না। পুরুষ ও রমণী সমাজ-দেহের দুইখানি পা। উহার একখানি দুর্ব্বল বা বিকল হইলে, আর একখানি সুচারুরূপে চলিতে পারে না। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পায়ের উপরে পা রাখিতে চেষ্টা করিবে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে চলচ্ছক্তি-বিহীন হইবে। নরনারীর মধ্যে অসাম্য স্থাপিত হইয়া যে জাতিভেদ পোষিত হইতেছে, সেই জাতিভেদ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জন-সমাজের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। বহুকাল পর্য্যন্ত মানব-জাতিকে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বংশগত জাতিভেদ কিরূপে রক্ষিত হইতেছে, এবং উহা-দ্বারা জনসমাজের কিরূপ অপকার হইতেছে, অতঃপর তাহাই দেখা যাউক। রাম অতি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; পবিত্র চরিত্র ও পরম জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া, সমাজে ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ লাভ করিয়াছিলেন। শ্যাম রামের মত জ্ঞানবান বা ধর্ম্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না বলিয়া, ঐ পদ বা সম্ভ্রম লাভ করিতে পারেন নাই, কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিতেন। রামের পুত্র যদু বিদ্যা, যুক্তি বা চরিত্র-বলে শ্যাম অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়াছে, আর শ্যামর পুত্র মধু রাম অপেক্ষাও পূতচরিত্র ও জ্ঞানবান হইয়াছেন। তথাপি রামের পুত্র বলিয়াই, যদু শ্যামের পুত্রের মধুর ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবে, এইরূপ ভেদ-জ্ঞানকেই বংশগত জাতি-ভেদ বলা যায়। এই জাতিভেদ যে অন্যায়পরতা পদে স্খলিত করে, তাহা আর বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন কি?

এ দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিরূপে যে সকল সামাজিক শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে,মন্বাদির প্রণীত সংহিতা-গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যায় যে, কর্ম্ম বা ব্যবসায়ই তাহার মূল। বংশানুক্রমে কর্ম্ম বা ব্যবসায় প্রচলিত রাখা, এবং তদুপরে সমাজের শ্রেণী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত রাখা, প্রেম ও ভক্তির একেবারেই বিরুদ্ধাচার,তাহাতে সন্দেহ নাই। রামের পিতা ভট্টাচার্য্য ছিলেন। রাম কিন্তু এত জড়বুদ্ধি যে,ব্যাকরণের প্রথম সূত্রই পাঁচ বৎসরে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শ্যামের পিতা অশিক্ষিত ছিল, সূত্রধরের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। শ্যাম কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হইয়াছেন। বংশগত জাতি-ভেদের খাতিরে, রামকে জোর করিয়া ভট্টাচার্য্যের পদে প্রতি-ষ্ঠিত রাখা, আর শ্যামকে সূত্রধরের কার্য্যে নিয়োগ করা, এক দিকে যেমন ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা, আর একদিকে তেমনই প্রেম-ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করা নয় কি? ধনীর সন্তান দরিদ্র হইলেও ধনী, রূপবানের সন্তান কদাকার হইলেও রূপবান বিবেচিত হওয়া যেমন অসঙ্গত ও হাস্যকর, ভট্টাচার্য্যের সন্তান গণ্ডমূর্খ হইয়া ভট্টাচার্য্য থাকাও ঠিক সেইরূপ। যে ব্যক্তি প্রখর মস্তিষ্ক বা উন্নত হৃদয় লইয়া সূত্রধরের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, বিধাতার কার্য্য ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচার করিয়া, তাহাকে হীন কার্য্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা ভক্তি ও প্রেমের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ নহে কি?

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে শিক্ষার ফলে ও অবস্থার শাসনে

কর্ম্ম বা ব্যবসায় পূর্ব্বের মত বিভিন্ন শ্রেণীতে আর আবদ্ধ নাই। এইক্ষণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র অনায়াসেই দোকান পাতিয়া তৈল বিক্রয় করিতেছে; আর তৈলকারের পুত্রও রাজনীতিজ্ঞের আসনে উপবেশন করিতেছেন। এ সময়ে এদেশে বংশগত জাতিভেদ রক্ষার চেষ্টা যে ঘোরতর অপকর্ম্ম, তাহা বলাই বাহুল্য। পাচক ব্রাহ্মণের পুত্র পাউরুটি-বিক্রেতা যদি তৈল-কার রাজনীতিজ্ঞের পুত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ ও নবনীত উপেক্ষা করিয়া, গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ করাই বিধেয়!

কাহারও কাহারও এইরূপ সংস্কার আছে যে, বংশগত জাতিভেদে ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, একই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য লোকে পুরুষাণুক্রমে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে; তাহাতেই উহার উন্নতি হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এরূপ সংস্কার যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক স্নেহবশতঃই পিতামাতা সন্তানদিগকে নিজ-কৃত কার্য্য বা ব্যবসায় অথবা তদপেক্ষা উন্নততর কার্য্য বা ব্যব-সায়ের উপযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে। তাহাতেই কার্য্য বা ব্যবসায়ের অব্যাহত উন্নতি হইয়া থাকে। যদি তন্তুবায়ের পুত্র তন্তুবায় থাকিলেই বস্ত্র-বয়ন ব্যবসায়ের চরমোন্নতি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে আর বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় বস্ত্রনির্ম্মাতাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। বংশগত জাতিভেদের খাতিরে এদেশে বস্ত্রবয়ন কার্য্য যে বহু

শতাব্দী পর্য্যন্ত পুরুষাণুক্রমিক ব্যবসায়রূপেই প্রচলিত ছিল।

ন্যায় ও প্রেমের বিধান লঙ্ঘন করিয়া, এদেশে বংশগত জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাতেই নিম্নলিখিত কুফল ফলিয়া, এদেশের অধিবাসিদিগকে দুঃখ ও দুর্দ্দশায় নিপীড়িত করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদের জন্য জনসাধারণের প্রতিভা ও রুচি স্বাভাবিক প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না; উহা শৃঙ্খলবদ্ধ থাকায় ক্রমে জাতীয় জীবন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। প্রতিবর্ষে কর্ম্মকারি, কুম্ভকার ও কৃষকের গৃহে সহস্র সহস্র প্রতিভাশালী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াও, আপনাদিগের মেধাশক্তি ও রুচি অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেছে না। অনিচ্ছায় অনুপযোগী কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মাচার্য্য, বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী বা অদ্বিতীয় বীরপুরুষ হইতে পারিত, সে-ই অলস শ্রমজীবী, অপারগ শিল্পী বা অনুপযুক্ত কৃষক হইয়া, আপনাদিগের জীবন ও আপন সমাজকে হীনদশাপন্ন করিয়া রাখিতেছে।

বংশগত জাতিভেদের আর এক মহানিষ্টকারী কুফল এই যে, উহার জন্য জাতি-সাধারণের মধ্যে আদান-প্রদান হইতে পারে না। প্রেম ও পবিত্রতার অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া, সমাজমধ্যে উদ্বাহ-কার্য্যের যতই প্রসার বৃদ্ধি হয়, যত অধিক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শোণিতের বিস্তার হয়, জাতীয় জীবনের সজীবতা ততই বৃদ্ধি হয়, সমাজ-মধ্যে একতাও ততই বৃদ্ধি

পাইয়া থাকে। সজীবতা ও একতা ভিন্ন জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় সম্ভবেনা।

বংশগত জাতিভেদে ক্রমে জন-সাধারণের মন হইতে সাম্য ও স্বাধীনতার ভাব তিরোহিত হইতে থাকে। সুতরাং স্বদেশানুরাগ (Patriotism) জাতি সাধারণের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেশ স্বাধীন হইলে, বা ধনমানে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইলেও, যখন কেবল দুই বা চারি বংশের লোকেরাই সুখ স্বচ্ছন্দ বা প্রাধান্য লাভ করিবে, অপর সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়া যায়, তখন জাতি-সাধারণ দেশের স্বাধীনতা বা সমৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ করিয়া কখনই যত্ন করিতে পারে না। রজকের গর্দ্দভ অপহৃত হইবার ভয় করিবে কেন? গর্দ্দভ জানে যে, রজকই হউক আর তস্করই হউক, যাহার নিকটে থাকিবে, তাহারই ভার বহন করিতে হইবে! যাহার সর্ব্বত্রই অধীনতা ও হীন দশা, তাহার আবার দেশের স্বাধীনতার বা উন্নতির স্পৃহা থাকিতে পারে কি?

বংশগত জাতিভেদ ভগবানের ন্যায় ও প্রেম-বিধানের এতই বিরোধী যে, উহার অনুশাসনে যে একবার হীন দশা প্রাপ্ত হয়, সে হীন হইতে আরও হীন হইয়া যায়; গুণ ও চরিত্রের উৎকর্ষ লাভের জন্য তাহার আর যত্ন থাকেনা। পুরোহিতের পুত্র জানে যে, সে যেমন চরিত্রের লোকই হউক না কেন, পৌরহিত্য করিয়াই তাহার দিন চলিবে। পাদুকা-কারের পুত্রও জানে যে, সে যত জ্ঞানী হউক না কেন, পাদুকা নির্ম্মাণ ভিন্ন

তাহার জীবনের অন্ত কার্য্য নাই। সুতরাং নিজ নিজ কৌলিক কার্য্য করিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। যেরূপ ভেদজ্ঞানে মানুষকে এত হীন করিয়া ফেলে যে, গুণ ও চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনে যত্নহীন করিতে পারে, গুণ ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর যত্নশীল করিয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ও রক্ষা করিতে শিক্ষা দেয় না, তাহা যে প্রত্যবায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহাতে আর কি ভুল আছে? এই ভেদজ্ঞানই ভারত-সমাজের অস্থিমাংস বিষকৃমির ন্যায় অবিরত দংশন করিতেছে! এই বিষকৃমি নিহত বা বিদূরীত না হইলে, এদেশের জাতীয় অভ্যুদয় কদাপি সম্ভব হইবে না।

দেশগত জাতিভেদও বিধাতার নিয়মের গুরুতর বিরুদ্ধাচার, সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তির জন্ম ভারতবর্ষে, আর এক ব্যক্তির জন্ম চীন দেশে, কেবল এই জন্যই যদি উহার এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে প্রেম ও ন্যায়-বিধানের বিরুদ্ধাচার করা হইবে। বীরত্ব, ধীরত্ব, দয়া ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি মনুষ্যত্বের লক্ষণ গুলি কি কোন দেশীয় লোকের স্বতঃসিদ্ধ সম্পত্তি? ভারতবর্ষের মূর্খ কি চীনের পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী? তবে এইরূপ ভেদ-জ্ঞানের মূল কোথায়? আমি ইউরোপবাসী, তুমি আসিয়াখণ্ডের লোক; কিন্তু উভয়েই সমান গুণজ্ঞান-সাপেক্ষ সমান দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করি। তুমি আসিয়া-খণ্ডবাসী বলিয়া, আমা অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক পাইলে, মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করা হইবে না কি? আমি ইউ-

রোপীয় বলিয়া, যদি তোমাকে হত্যা করিয়া সামান্য অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাই, আর তুমি আমাকে প্রহার করিবার চেষ্টা করিলেও, যদি নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হও, তাহা হইলে ন্যায়-জ্ঞানের কতইনা লাঞ্ছনা হইবে। ন্যায়জ্ঞান ও প্রেম-বিধানের এইরূপ লাঞ্ছনা যেখানে হয়, সেখানেই উদারতা, বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের ধ্বংশ হইয়া, ক্রমে জনসমাজ অধঃপাতে যাইতে থাকে। ঈদৃশ ভেদ-জ্ঞান বলবৎ রাখিয়া, যাহারা, আপাততঃ স্বার্থসাধন করিতে চায়, অলক্ষিতভাবে মনুষ্যত্ব হারাইয়া, তাহারাও পরিণামে পরম দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতার পথে অসঙ্গত প্রতিবন্ধক স্থাপন করিয়া, যে ব্যক্তি কৃতীত্ব লাভ বা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সত্য সত্যই কাপুরুষ বলিতে হয়। স্বার্থপরতা, কুটিলতা ও কাপুরুষতা সমাজের সুখসমৃদ্ধি পরিণামে সংহারই করিয়া থাকে। আপনার উন্নতি করিয়া, সমাজের সুখসম্পদ স্থায়ী ভিত্তিতে সংস্থাপন করিতে হইলে, উদারতা,ন্যায়পরতা ও সৎসাহস অবলম্বন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়। প্রেম ও ভক্তির পথ ভিন্ন অন্যত্র এ সকল সদ্‌গুণ-সাধনের ক্ষেত্র নাই। জাতিভেদ প্রেম ও ভক্তির বিরোধী,সুতরাং মহাপাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলেই, তাহার গত জীবন চিন্তা করিতে হয়। কেবল চিন্তা করিতে হয় না, উহা আপনা আপনি আসিয়া স্মৃতিপথে উদিত হয়। অনেক সময়ে গত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্যও নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া, পূর্ব্ব জীবন পর জীবনের অব্যর্থ পরিণাম-প্রকাশক নহে। নিতান্ত শিশু অপেক্ষা যুবকের জীবিত থাকিবার অধিকতর সম্ভাবনা বটে, কিন্তু রুগ্ন যুবক অপেক্ষা বলিষ্ঠ শিশুর বাঁচিবার আশা অধিক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেরই এরূপ ধারণা। ফলতঃ কোন মনুষ্য-জীবনই হউক, কিম্বা কোন ঘটনাই হউক, উহার স্থায়ীত্ব বা পরিণাম-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার প্রকৃতি বা প্রধান প্রধান লক্ষণ, এবং চতুর্দ্দিকের আনুষঙ্গিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই, ফলাফল গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অপূর্ণজ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত ও প্রশস্ত পথ আর নাই। আমরাও ঐ পথেরই অনুসরণ করিব।

যে দিন পুরুষপুঙ্গব মহাত্মা রামমোহন ভারতভূমে

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহামন্ত্র ঘোষণা করেন, সে দিন বহু দূরবর্ত্তী নহে। এই ইতিহাস-আদর-শূন্য দেশে আজিও ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দীমাত্র-ব্যাপী ইতিহাস অন্ধকারাবৃত হয় নাই। বাঙ্গালি চরিত্রের হীনতা দোষে, পক্ষপাত ও অজ্ঞতার বশে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক গুরুতর ঘটনা উপেক্ষিত, অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য অলৌকিক কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত, এবং অনেক স্মরণীয় লোককে উপেক্ষা করিয়া, অনেক অনুপযুক্ত লোককে সমধিক শ্রদ্ধা করা হইয়াছে; ব্রাহ্মসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, সন্দেহ নাই। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত এখনও পুরাণ-প্রসঙ্গে পরিণত হয় নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেরূপ হইবার আশঙ্কাও নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ক্রমে বৈদান্তিকতা, স্বভাববাদ ও সহজজ্ঞান-বাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বে অনুষ্ঠান-বিহীন, পরে আংশিক অনুষ্ঠানপ্রিয়, এবং তৎপরে পূর্ণ সংস্কারবাদী হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন, এতাবৎ কাল ব্রাহ্মসমাজের গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই, ব্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত উহার জীবন স্বাভাবিক

এবং ক্রমোন্নতিশীল, ইহা ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে মঙ্গলসূচক সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র ইহার উপর নির্ভর করিয়াই, আমরা উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, অথবা মহতী আশাযুক্ত হইতে পারি না। পঞ্চাশৎ বর্ষ-কাল যাহা জনসমাজে ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে, তাহাই যে চিরজীবী হইবে, অথবা চিরকাল জগতের সুখসম্পাদন করিতে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। সহস্র সহস্র বৎসর মনুষ্যের পূজনীয় থাকিয়া, শত শত রাজত্ব ধ্বংশ করিয়া, শত শত অভিনব সমাজ সংগঠন করিয়া, এবং প্রজ্বলিত হুতাশন-সম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রধাবিত হইয়াও, কত ধর্ম্মের বিলোপ হইল, কত সম্প্রদায় নির্জীব হইল। ইতিহাসের কোন্ প্রকৃত শিষ্য, ন্যায়ের কোন্ প্রকৃত উপাসক সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, এই পঞ্চাশৎ বর্ষ-কাল ব্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিয়াছে বলিয়াই, ইহা সমস্ত জগতে ব্যাপৃত ও চিরস্থায়ী হইবে? প্রত্যুতঃ বলিতে গেলে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজের ভূত ইতিহাস পাঠ করিয়াই, আমরা উহার ভবিষ্যৎ গণনায় কৃতনিশ্চয় হইতে পারি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে হইলে, উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার প্রকৃতি, এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তবে এখন আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হই।

তুলনায় চিন্তা করা আমাদিগের অভ্যাস। কোন বিষয় মনে উপস্থিত হইলে, তৎসঙ্গে বিষয়ান্তর বা পদার্থান্তরের তুলনা

করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। আমরা মনোরাজ্যের ও সমাজতত্ত্বের অনেক বিষয়ের জড়জগতের পদার্থাদির সঙ্গে, এবং ভৌতিক অনেক ঘটনার অধ্যাত্ম রাজ্যের অনেক ঘটনার সঙ্গে তুলনা করিতে ভালবাসি। ঐরূপ তুলনার সামঞ্জস্য হইলে, আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দ হয়, এবং চিন্তনীয় বিষয়ও সহজে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। অদ্যও আমরা তাহাই করিব।

আমরা এই কোটি কোটি লোকের সমষ্টি মনুষ্য-সমাজকে এক অতি বিস্তৃত মহাসমুদ্ররূপে দর্শন করি। মহাসমুদ্র যেমন দ্বীপ, উপদ্বীপ ও পর্ব্বতাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া সাগর, উপসাগর ও সাগর-শাখাদিতে পরিণত হইয়াছে, মনুষ্য-সমাজও, দেশ, প্রদেশাদিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেইরূপ নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। সাগরের অঙ্গে যেমন নানা অবস্থা বশতঃ, নানা স্থানে নানারূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়; জনসমাজেও সেইরূপ সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতিঘটিত নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। বায়ুপ্রবাহের প্রবলতা, মৃদুতা বা প্রসার, এবং জলস্রোতের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা প্রভৃতি অনুসারে, তরঙ্গ যেমন অল্প বা অধিক কাল স্থায়ী হয়, সত্যের সমধিক বা আংশিক প্রচার, এবং স্বাভাবিক নিয়মের, সুতরাং মনুষ্য-প্রকৃতির অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা অনুসারেও সমাজে আন্দোলন অল্প অথবা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বায়ু যেমন তরঙ্গের জীবন, সত্যও সেইরূপ আন্দোলনের প্রাণ; জলস্রোত যেমন তরঙ্গের কার্য্যক্ষেত্র, লোক-প্রকৃতিও

সেইরূপ আন্দোলনের কার্য্যক্ষেত্র। জলস্রোতের প্রতিকূল-গামী তরঙ্গের ন্যায়, জগতে অনেক অস্বাভাবিক আন্দোলনেরও আশুবৃদ্ধি বা বাড়াবাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, অচিরে বিলীন হইয়া যায়। এই জন-সমাজরূপ মহাসমুদ্রে প্রতিনিয়তই তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজ কত কত আন্দোলনেই না আন্দোলিত হইয়াছে! এই সমাজসাগরের অঙ্গে কোথাও একটী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছাইয়া চলিয়াছে, কতদূর যাইয়াই আবার তাহা গভীর জলরাশিতে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া কতদূর অগ্রসর হইলেই, পশ্চাৎ হইতে প্রবলতর আর এক তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জনসমাজের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহা প্রাগুক্তরূপ তরঙ্গ বা আন্দোলনপরম্পরার ফল মাত্র। জনসমাজরূপ মহাসমুদ্রের এক প্রধান অঙ্গ ভারতবর্ষেই এইরূপ কত তরঙ্গ উঠিয়াছিল। বেদের তরঙ্গ, বেদান্ত বা উপনিষদের তরঙ্গ, দর্শনের তরঙ্গ, বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ, তন্ত্র ও পুরাণের তরঙ্গ, মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গ, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের তরঙ্গ এবং অবশেষে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাতরঙ্গ।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাই বলুন, স্থুল-দর্শীরা যাহাই ভাবুন না কেন, একথা সত্য যে, বায়ুপ্রবাহ ভিন্ন যেমন তরঙ্গ উত্থিত হয় না, সত্যের প্রচার ভিন্নও জগতে কোন আন্দোলন উত্থিত হইতে পারে না। তুমি যাহাকে সত্য মনে

করিতেছ, আমি তাহাকে অসত্য মনে করিতে পারি। কিন্তু যতদিন না কতকগুলি লোক কতকগুলি সূত্রকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যতদিন না তাহারা ঐ সকল সত্য প্রচার করিতে ও জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, ততদিন কোন রূপ আন্দোলনই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু যাই বায়ুপ্রবাহ থামিয়া গেল, আর তরঙ্গ নাই; সত্যের প্রচারও বন্ধ হইল, সমাজ স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। বহু বিস্তৃত হিন্দুসমাজে এখন সত্যের প্রচার নাই, সকলেই শাস্ত্রোক্তিতে পরিতৃপ্ত, কেহই শাস্ত্রানুরূপ জীবনযাপনে যত্নশীল নহে। হিন্দু সমাজ অবাতকম্পিত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চল ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সত্যের প্রচারে যেমন আন্দোলন উপস্থিত হয়, আবার সেই সত্যের প্রচার সম্পূর্ণরূপে লোক প্রকৃতির অনুকূল হইলেই সেই আন্দোলন চিরস্থায়ী হয়। প্রবল বায়ুর সংঘর্ষণেও যেমন খরতর স্রোতজলের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তুমি আমি কিছু ধ্রুব সত্য বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেও, যদি তাহা লোক প্রকৃতির নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত হইবে না, তাহাতে সমাজ আন্দোলিত হইবে না। ফলতঃ বায়ুপ্রবাহের অভাব বা সংকীর্ণতা, এবং জলস্রোতের প্রবল প্রতিকূলতাই যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিবার, সমুদ্র আন্দোলিত হইবার প্রতিবন্ধক, সত্যের আংশিক প্রচার বা অপ্রচার এবং লোক-প্রকৃতির প্রবল প্রতিকূলতাই সেইরূপ সমাজ আন্দোলিত

হইবার প্রবল প্রতিবন্ধক। বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যে আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, উহার উপকরণ গুলি পরীক্ষা করিলেই, আমরা উহার পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে পারিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আন্দোলনমাত্রেরই প্রাণ সত্যের প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ প্রবল আন্দোলনের প্রাণ যে সত্যের প্রচার, তাহা কি কস্মিন্ কালেও সংকীর্ণ বা আবদ্ধ হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সকল সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কস্মিন্ কালেও পুরাতন হইবে না। সেই সকল সত্য লইয়া জগতের লোক যতই ঘর্ষণ করিবে, তাহা হইতে নূতন নূতন সত্য প্রকাশিত হইয়া, জনসমাজকে ততই কার্য্যতৎপর ও ব্যতিব্যস্ত রাখিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনাদির সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধ নাই। অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন দূরবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র-বিশেষকে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়া, উহার উপাসনাই ধর্ম্মসাধনের চরম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না যে, কল্য যখন বিজ্ঞান যন্ত্র-সহযোগে সেই উপাস্য দেবতাকে জড়পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বা প্রচারের অবসান হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নাই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইবে, আর দর্শনাদির কুটিল তর্কে পরাভূত হইয়া, শিক্ষিত ও মার্জ্জিত অন্তঃকরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অন্তঃপুরের অশিক্ষিত মহিলাদিগকে, অথবা অন্ধ ভক্তির অনুসরণ করিতে করিতে যাহারা অভক্তির আলয় হইয়াছে, সেই সকল

অপদার্থ লোককে আশ্রয় করিবে। যে সকল সার্ব্বভৌম সত্য সমস্ত মনুষ্যহৃদয় যুগপৎ স্বীকার করে, যে সকল সত্যের অকাট্য সারবত্তায় জগতের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সংশয় বা প্রশ্ন করে নাই, যে সকল সত্য সংসার ও সমাজবন্ধনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং দশদিকে হস্তপদ প্রসারিত করিয়া সত্যসংগ্রহে নিরত রহিয়াছেন, আর সেখানে যে সত্য পাইতেছেন, তদ্দারাই আপনার অঙ্গ পুষ্ট ও অলঙ্কৃত করিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল গ্রন্থবিশেষে আবদ্ধ নহে। বেদ, বাইবেল, আবেস্তা বা কোরাণ, ইহার কোন গ্রন্থ হইতে সত্যসংগ্রহ করিতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কুণ্ঠিত নহেন। একখানি পুরাতন পুস্তকে অনন্ত কালের সম্ভজনীয় অনন্ত সত্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, এবং উল্লিখিত পুস্তকের বিরুদ্ধ যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই অসত্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসকল ব্যক্তিবিশেষেও আবদ্ধ নহে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা শতবর্ষ-কালও যাঁহার জীবনের ব্যাপ্তি ছিল না, তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জনসমাজের অভ্রান্ত উপদেষ্টা থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ কুশিক্ষাও প্রদান করেন না; ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যক্তি-বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার বা বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া স্বীকার করেন না যে, সমাজ তাঁহার মুখনিঃসৃত ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রলাপ বাক্যও আপ্ত বাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকমাত্রকেই

ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইবার অধিকার প্রদান করেন। ব্রাহ্মোপাসকগণ সম্মুখীনভাবে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সত্য লাভ করিতে, ও লব্ধ সত্যের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিয়া লইতে পারেন। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের আবিষ্কার বা প্রচার যে অবরুদ্ধ বা আংশিক হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই।

এক দিন ভাবিতে ভাবিতে, আমরা এইরূপ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। একদা আমরা শুনিলাম, যেন স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল; সেই বাণী নরলোককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে সংসারবাসী মনুষ্যমণ্ডলি! একবার তোমাদিগের চিত্ত উদ্‌ঘাটন কর।" জনসমাজ উৎসুক চিত্তে তাহাই করিল। তখন সেই সকল মানবাত্মার মধ্য হইতে কতকগুলি জ্যোতি সমুত্থিত হইয়া, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবির্ভাব হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, মানব-জাতিকে কহিতে লাগিলেন, "হে মানবগণ! তোমাদের অন্তরের কতকগুলি অক্ষয় ও অবিনশ্বর ভাব লইয়া আমার জন্ম হইল। এইক্ষণ হইতে তোমাদিগের ও আমার স্রষ্টা যে পরমেশ্বর, তাঁহার ও তোমাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমি অবস্থিতি করিব। তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। আমি তোমাদিগের হিতকামনা করিব; তোমরাও সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে রক্ষা কর, এবং আমার মাহাত্ম্য বিস্তারে সচেষ্ট হও।"

তখন লোক-সমাজ অবনত-মস্তকে সেই মহাপুরুষের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কহিল, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও প্রিয়তম, জানিলাম, কিন্তু কোথা হইতে কি উপদেশ লইয়া, কি উপায়ে আপনার অঙ্গপুষ্টি হইবে?" জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিলেন, "এই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ কর। সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সত্যের আবিষ্কার, ও অনেক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সত্য আনিয়া আমার দেহপুষ্টি সাধন কর। কিন্তু সাবধান! ভ্রমবশতঃ মনুষ্য অনেক অসত্যকেও সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, এবং আপনাদিগের পতনের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া, অনেক কুকথা ও কুক্রিয়া ভগবানের স্কন্ধে পর্য্যন্ত আরোপ করিয়াছে। তোমরা সে সকল সংগ্রহ করিও না।" জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের এই কথা শুনিয়া, লোক-সমাজ ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল, এবং বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে উপহার দিতে লাগিল। মহাপুরুষ সে সকলকে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিলেন। কত সত্য এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, আমাদিগের পাপ চক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটী দেখিয়াছিল, তাহা এইরূপ যথা,—ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আনীত যেটী, তাহা এই, "ঈশ্বর এক, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।" হিন্দুশাস্ত্র হইতে এইরূপ একটী আনীত হই-

য়াছিল, যথা—"ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে অনুপ্রাণিত।" খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এই সত্যটী আনীত হইয়াছিল, যথা, ঈশ্বর পিতা এবং নরনারী সমস্ত ভ্রাতা-ভগিনী।" ইত্যাদি।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবার লোকসমাজকে কহিলেন—"অতঃপর তোমরা কেবল পুরাতন সম্প্রদায় ও পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না। আপনারা স্বাধীনভাবে সত্যরত্ন সংগ্রহ করিয়া আমাকে ভূষিত কর।" তখন মনুষ্যসমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সংসার-ক্ষেত্রে হৃদয় ও মনের পরিচালনা করিতে লাগিল, এবং তাহাতেও অসংখ্য সত্যের উদ্ধার হইল। সেই সকল সত্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের অঙ্গে সংযোজিত হইল। মনুষ্যবুদ্ধি জড়জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌরজগতের পর সৌরজগৎ সমুত্তীর্ণ হইয়া, যখন কোটি কোটি নক্ষত্রলোক দেখিতে লাগিল, তখন সিদ্ধান্ত করিল, এই বিশ্ব এবং তাহার স্রষ্টা অনন্ত। অমনি সেই সত্যটী নিয়া পূজনীয় দেবতার চরণে উপহার দিল। মনুষ্য আপন হৃদয়মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, সমগ্র লোকসমাজ ঐ স্থানে প্রতিফলিত হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য দেখিল, ইহা অপেক্ষা সুখকর দৃশ্য আর নাই। অমনি "প্রীতিই পরম সাধন" বলিয়া স্বীকার করিল এবং ঐ সত্য পূজনীয় দেবতাকে উপহার প্রদান করিলে, দেবতা উহা কণ্ঠে ধারণ করিলেন। আর একবার মনুষ্য আপনার অন্তরাত্মায় অবগাহন করিয়া দেখিল,

গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে শান্তির জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইতেছে, এবং কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে তাহাকে সেই সুশীতল রশ্মির উৎসের দিকে টানিতেছে; মানবাত্মা সেই আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তখনই মনুষ্য বলিয়া উঠিল, "বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল," এবং এই সত্য পূজনীয় দেবতাকে উপ-হার প্রদান করিলে, তিনি তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। এই রূপে লোকসমাজ পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জড়জগৎ ও অধ্যাত্মরাজ্য হইতে অনন্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া, অনন্ত কালের জন্য সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার পরিচর্য্যা করিতে থাকিল।

আমাদিগের এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এই মহাপুরুষ আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম। সত্যই ইহাঁর প্রাণ, সত্যই ইহাঁর দেহ, সত্যই ইহাঁর আহার এবং সত্যই ইহাঁর উপভোগ্য। এই মহাপুরুষ ইতিহাসের সমাদর করেন, জ্ঞানী ও ভক্তের সমাদর করেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্মান করেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে, মানবজাতির ও মনুষ্য প্রকৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন সত্যের আবিষ্কার হইবে, যিনি তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প, তাঁহার কি জরামরণ আছে? জ্ঞানের কোন্ শিষ্য, অন্ধভক্তির কোন্ উপাসক, সাহস করিয়া বলিতে পারে, এরূপ ধর্ম্মের ক্ষয় আছে, এরূপ ধর্ম্মের ক্রমে জয় হইবে না? বস্তুতঃ, এরূপ সর্ব্বতোমুখ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মে কদাপি অসত্যের স্থান হইবে না, নূতন সত্যের অবিষ্কারের অবরোধ হইবে না, এবং সত্যের আংশিক

প্রচারও হইবে না। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্তকাল জীবিত থাকিবেক, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনন্ত কালেও তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরকাল জগতের ধর্ম্মরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মকে সীমাবিশিষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ুকে সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়া জগতের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি পুরাতন সংস্কারের বশবর্ত্তী ও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছেন, "বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম; পুরাতন হিন্দু শাস্ত্র সকল মন্থন করিলেই হইতে পারে, অন্যদেশে গমন বা বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই।" এ কথার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা বহু আয়াস সাধ্য নহে। কি জড় জগৎ কি আধ্যাত্ম জগৎ, সংসারের সৃষ্টি-অবধি এপর্য্যন্ত স্থানভেদে ও কালভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও ভাব জন্মিয়াছে, কত নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, ও কত নূতন সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অস্মদ্দেশে প্রাচীন কালে যে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি ও প্রচার হইয়াছিল, ইউরোপীয় পুরাবৃত্তে তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে যে সকল রাজনৈতিক সত্যের প্রচার হইয়াছে, ভারতে কস্মিন্‌কালেও তাহা ছিল না। ইদানীন্তন পাশ্চাত্যদিগের রাজনৈতিক সর্ব্বতন্ত্রতা

প্রাচীন ভারতে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের মলয় পর্ব্বত যেমন পেরু দেশের শোভা সম্বর্দ্ধন করে না, আমেরিকার গোপাদপও সেইরূপ ভারতের উদ্যান সুশোভিত করে না। ভাগীরথীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, সাহারার প্রখর তাপ বা গ্রীনলণ্ডের প্রবল শৈত্য অনুভব করিতে উপদেশ করা যেরূপ, একমাত্র সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া হোমার, সেক্স-পীয়র, দান্তে প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় সমস্ত কবিদিগের প্রচারিত কাব্যের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকার প্রদান করা যেমন, একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুশীলন করিয়াই, সার্ব্বভৌম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সমস্ত সত্য আয়ত্ব করিবার উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

কে না স্বীকার করিবে, হিন্দুধর্ম্ম অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী? কে না স্বীকার করিবে, হিন্দুপুরাণ সমূহ মানব হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি-সাধক, সৌন্দর্য্যের আকরস্বরূপ? কে না স্বীকার করিবে, হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্র অসংখ্য রত্নে পরিপূর্ণ? ব্রাহ্মধর্ম্মই ঘোষণা করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মে যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাই বলিয়া, হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম, একথা বলিবার অধিকার জন্মে না। একথাও যদি স্বীকার করি যে, সত্য সত্যই জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, তাহাতেই কি বলিতে পারা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মের সীমার মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ? কখনই নহে। আপনার রুচি, সুবিধা বা বাল্যসংস্কারের বশ হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আনয়ন করিতে

চেষ্টা করা অনুচিত। যাহাতে দেশ, কাল ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল স্থল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সংগৃহীত হইতে পারে, অনন্ত সত্যের উৎস সংসারের সকল স্থল ও সকল দিক হইতে নির্ম্মুক্ত-ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বংশপরম্পরায় ও লোকপরম্পরায় অনন্তকাল নূতন ও সজীব ধর্ম্ম থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অন্য দেশ বা অন্য সম্প্রদায়ের উপরে বিদ্বেষ বা অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, অলক্ষিত জাতিভেদের প্রচার ও পোষণ করা অতি অসঙ্গত কার্য্য।

কোন কোন লোক ক্ষুরধারসম ধর্ম্মপথে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, ভাবুকতার বাড়াবাড়ি করিয়া, অথবা মনুষ্য-চরিত্রের অপরবিধ দুর্ব্বলতাবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও উচ্চ লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এবং তার পর আপনাদিগের ভ্রান্ত মনকে প্রবোধ দিবার জন্য, অথবা আপনাদিগের পদস্খলনের পক্ষ-সমর্থন করিতে যাইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কতকগুলি পুরাণপ্রচলিত মিষ্ট কথায় আবৃত করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গে ভয়ানক বিষ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা পৌরহিত্যের প্রত্যক্ষ চিহ্ন-স্বরূপ গৈরিক বসনাদি ধারণ করিতেছেন। কেহ মনে করিবেন না, আমরা কাহারও নিন্দা করিতেছি; মনের দুঃখের কথাই বলিতেছি। কেহবা ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে আঘাত করি-

তেছেন! হায়! এই সকল অসদাচরণে সমূহ ক্ষতি হইতেছে; ইহাতে জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে হেয় করিতেছে, সন্দেহ নাই।

ঐ সকল লোকের কথার বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। অধিক কথা না বলিয়া, একটীর উল্লেখ করিলেই চলিতে পারে। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন যে, সংসারে মনুষ্যমাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং তাহারই মার্জনা ও পরিচালনা করিয়া,উত্তর কালে ছোট বা বড় হইয়া থাকে। অনেক স্থলে প্রভূত স্বাভাবিক শক্তিও,শিক্ষা এবং পরিচালনার অভাবে বিলুপ্তবৎ থাকে; আবার কোথাও বা অল্প শক্তিও সুশিক্ষা এবং উপযুক্ত চালনাদ্বারা সংসার-ক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যিনি তেজস্বিনী মেধাশক্তি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন, সুশিক্ষা ও সুসংসর্গ পাইলে, তিনিই দার্শনিক হইতে পারেন; যিনি প্রশস্ত হৃদয় এবং কল্পনাশক্তি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন, সুযোগ পাইলে, তিনি কবি হইতে পারেন; আর যিনি প্রবল বিবেকশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সাধনা করিলে, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। স্বাভাবিক শক্তি, সুযোগ ও সাধনার মিলন হইলেই, লোক বড় লোক হন; দার্শনিক, কবি বা ভক্ত হইয়া তাঁহারাই পৃথিবীতে পরিচালক বা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবানের গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায়-সাধন-জন্যই লোক-

সমাজে অবস্থা ও শক্তির এরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানময় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সমাজের প্রয়োজন বশতঃই এরূপ হয়, এবং এই রূপে সমাজের সেই প্রয়োজন সাধিত হয়। সমাজের প্রয়োজন-সাধন-জন্যই ঈশা, মুসা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল। সমাজের এই প্রয়োজন-সাধন-জন্যই ব্যাস, বাল্মীকি, সেক্ষপীর ও দান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং সমাজের প্রয়োজন-সাধন-জন্যই কপিল, কনাদ, কোমৎ ও স্পেন্‌সারের জন্ম। ইঁহারা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সেই প্রয়োজন সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া, কোন অল্পবুদ্ধি লোক বলিতে পারে যে, ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অভ্রান্ত পদ-বিক্ষেপে বিচরণ করিয়াছেন? ঈশা বা চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মো-পদেশে কি ভ্রম নাই? সেক্ষপীর যে লোকচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বা বাল্মীকি রামায়ণে যে প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কি ভ্রম নাই? কপিল বা কোমতের মীমাংসা সকল কি সমস্তই প্রমাদশূন্য?

কিন্তু ঐ সকল লোক বলিবেন, "তোমার এত কথা আমরা শুনিব না, মনুষ্যের পাপহস্তের লিখিত ইতিহাসে আমরা বিশ্বাস করিব না; তোমাকে মানিতে হইবে, "আমরা স্বর্গ হইতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব আনয়ন করিতেছি, তাহাতে ভ্রম নাই; তাহাই তোমার পালনীয়। পালন না কর, তুমি পতিত; প্রতি-বাদ কর, তুমি ভগবানের বিধানের বিরোধী।" অহো! কি

বিড়ম্বনা !! তুমি যদি তাদৃশ অভ্রান্তবাদীর জীবনের হীনতা দেখিয়া অশ্রদ্ধাবান্ হও, এই আশঙ্কায় দেখ, তিনি এরূপ কথাও কহিয়া রাখিতেছেন, "হে মনুষ্য! সন্দেহ করিওনা, ভক্ত সাধক অন্ধকার রাত্রিতে প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারেন, তথাপি ভজনালয়ের মধ্যাসনে বসিয়া ধর্ম্মের নামে যাহা প্রচার করেন, তাহা সকলই সত্য ও মোক্ষপথের সোপান বলিয়া মানিতে হইবে।" তাঁহার এ কথায় তুমি যদি সন্দেহ বা দ্বিরুক্তি কর, তোমাকে এই বলিয়া নিরস্ত করা হইবে যে, ইহা গভীর যোগলব্ধ ঈশ্বরাদেশ !!

কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের অপব্যবহারের প্রতিবাদ করা আমাদিগের প্রসঙ্গের লক্ষ্য নহে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাঁহারা জগতের অনন্তকালস্থায়ী ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশবিশেষে অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রচারিত কোন একমাত্র পুরাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া, উহার মহাক্ষতি করিতে চাহেন, সেইরূপ যাঁহারা পরমেশ্বরের সদামুক্তদ্বার সদাব্রত-রূপ সংসারের মধ্যে কল্পিত বিধানাদির সৃষ্টি করেন, এবং মনুষ্য-বিশেষকে সেই বিধান-চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া, তাঁহার প্রচারিত সত্য সকলই বর্ত্তমান জগতের উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং যাঁহারা তৎ প্রচারিত কল্পনা-মাত্রকে অব্যর্থ ও মুক্তিপ্রদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মনুষ্য-

দিগকে উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের ততোঽধিক ক্ষতি করেন। বলিতে গেলে, তাঁহারা সত্যের অনন্ত উৎস ঈশ্বর ও জনসমাজের মধ্যে মনুষ্য-বিশেষকে নামে না হউক, কার্য্যতঃ অবতাররূপে স্থাপিত করিয়া, জগতে ধর্ম্মবিষয়ক সত্য-প্রচারের ব্যাঘাত জন্মান, এবং অপূর্ণ জ্ঞান মনুষ্যের প্রচারিত সমস্ত কথা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া, অনর্থক ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক অসত্য প্রচার করেন। অর্থাৎ দ্বিবিধ রূপেই তাঁহারা সত্যপ্রচাররূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইবার পরিপন্থী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের জীবন-নাশের পন্থা করেন। এই সকল লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী বলিলে, সত্যের অপলাপ করিয়া অপরাধী হইতে হয়, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট শক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজরূপ আন্দোলন বা তরঙ্গের প্রাণবায়ুর বিষয়ে আলোচনা করিলাম। আমরা দেখিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রাণবায়ুরূপ সত্যপ্রচারের কদাপি অবসান বা সংকীর্ণতা ঘটিবে না। উহা দেশে, কালে, মনুষ্য বা গ্রন্থবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং মনুষ্যের হৃদয়, মন ও সমস্ত স্বভাব, এবং সর্ব্বোপরি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে অনন্তকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচারিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি পুরাতন মৃত ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িকতা বা উপধর্ম্মে পরিণত হইতে পারিবে না।

এখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি বা লক্ষণের সমালোচনা করিব। আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি লোকপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের গতির সঙ্গে অভিন্ন। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই দেখিতে পান যে, স্বভাবের গতি দুই, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণ বিকাশ।(১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে Evolution অথবা ক্রমবিকাশনামক যে দার্শনিক সত্যের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার সঙ্গেই আর একটী সত্য অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বলি পূর্ণ বিকাশ। কথান্তরে আমরা ইহাকে "সমগ্র উন্নতি" বলিতে পারি। একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া, এ উভয় সূত্রকে বিশদ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। জরায়ু কোটরে যখন ভ্রূণবিন্দুর প্রথম উৎপত্তি

(১) পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া, তদনুরূপ চিন্তা প্রণালী যাঁহাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা পূর্ণবিকাশ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া, অনাবশ্যক মনে করিতে পারেন। তাঁহারা ভাবেন, পূর্ণবিকাশ যাহাকে বলা যায়, তাহা ক্রমবিকাশের মধ্যেই আছে। তাঁহাদিগের মতে উহা ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার অঙ্গ মাত্র। কিন্তু তাঁহাদিগের এই মীমাংসা সুসঙ্গত নহে। আভ্যন্তরিক শক্তি বা বিধাতার বিধিবশে পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া, ক্রমেই প্রসার বা উন্নত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহা এক কথা, আর পদার্থের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিজনক বিকাশ আর এক কথা। তর্ক করিতে গেলে ক্রমবিকাশকেও পূর্ণবিকাশরূপ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। পরম জ্ঞানময় বিধাতা পদার্থের বিকাশের মূলেই প্রসার ও সর্ব্বাঙ্গীনতা (Growth and Harmony) নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হয়, তাহা হইতে যে উত্তরকালে হস্তপদ ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট মনুষ্য সমুৎপন্ন হইবে, তখন তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু সেই ভ্রূণবিন্দুই ক্রমে শোণিত, পরে মাংসপিণ্ড ও তৎপরে মানবদেহের অবয়বে পরিণত হয়। পদার্থের মূলের এইরূপ পরিবর্ত্তনজনিত উন্নতিকে ক্রমবিকাশ (Evolution) বলে। ইহা যেমন সত্য; তেমনই আবার ইহাও সত্য যে, ঐ ক্ষুদ্রতম ভ্রূণবিন্দুর মধ্যেই উত্তরকালপ্রসূত মানব দেহের যাবতীয় উপকরণ অনুস্যূত ছিল। ভ্রূণবিন্দুর পরিবর্ত্তন ঘটিত উন্নতির সঙ্গে সমস্ত উপকরণেরও যুগপৎ উন্নতি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে পূর্ণবিকাশ বলি। স্থির মনে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব, এ উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতির দুইটী অনিবার্য্য লক্ষণ লুক্কায়িত রহিয়াছে; একটী উন্নতিশীলতা অপরটী উদারতা। অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন দিন দিন আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নতি সাধন করে, সেইরূপ তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অভিলাষ ও সাধন করে; অর্থাৎ নিজ মূর্ত্তির কোন অংশকেই উপেক্ষা করিয়া চলে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মেরও এই দুই প্রধান লক্ষণ; ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ক্রমোন্নতিশীল, তেমনই সম্পূর্ণ উদার। প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনে, কি সমাজে, কি সংসারে, কি অধ্যাত্ম রাজ্যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতা দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানসিক উন্নতি উপেক্ষা করিয়া, পানভোজনের ব্যবস্থা দেন না; ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় অন্ধ হইয়া, ঊর্দ্ধবাহু হইতে, নগ্ন

থাকিতে, অথবা অনশন বা স্বপাক-ভক্ষণদ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে উপদেশ করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যমনকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের প্রশ্রয় দিয়া, ভাবুকতার উপাসনা করিতে, অথবা হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া মনকে প্রশ্রয় দিয়া, শুষ্ক জ্ঞানের উপাসনা করিতে, অথবা হৃদয় মন উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, কল্পিত বিবেকের সাধনা করিয়া, ঈশ্বরের নামে কুসংস্কা-রের দাস হইতে উপদেশ দেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ভাবশূন্য ধার্ম্মিক অসম্ভব; ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে লোকালয়ত্যাগী বিদ্যাবুদ্ধির আলোচনাবিহীন ব্যক্তিও ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নহে, কুসংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি-স্বরূপ।

প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে যেমন সমগ্র উন্নতি ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য, মনুষ্য-সমাজেও তেমনই। ব্রাহ্মধর্ম্মই ধর্ম্মসাধনে বর্ণভেদ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ করিয়া, ধর্ম্মকে পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপভোগ্য ও অপর শ্রেণীর দূর হইতে উপাস্য করিয়া রাখেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মই নরনারীর সমান অধি-কার প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পত্নীকে পতির "সহ-ধর্ম্মিণী" করিয়া অথবা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ধমনী-বিশেষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কিম্বা মানবজাতির পতনের পথপ্রদর্শক বলিয়া, পুরুষের দাসী হইয়া থাকিতে আজ্ঞা করেন নাই। ব্রাহ্মের নিকটে "কামিনী কাঞ্চন" ধর্ম্মের সহায়, উহার অপব্যব-হারই নিন্দনীয় বটে। বাস্তব, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতিশীল, তেমনই উদার, অর্থাৎ লোকপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী।

অস্বাভাবিক শিক্ষা অথবা অস্বাভাবিক অনুষ্ঠান যে সকল ধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহা যেমন অস্থানে রোপিত বৃক্ষের মত, আজি হউক কালি হউক, শুষ্ক হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষ কদাপি সেরূপ নির্জীব হইবে না।

আর একটী কথা দেখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। জগতে অনেক সময়ে অনেক সত্যের প্রচার ও আবিষ্কার হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের শঠতা বা অসদ্ব্যবহারে আবার তাহা কলঙ্কিত ও তিরোহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেরূপ হইবার আশঙ্কা আছে কি ? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব "না"। যে সময়ে এবং যে অবস্থায় জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাতে সে ভয় আর নাই। অধুনা উদার শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া, পৃথিবীর সে দুঃখের দিনের অবসান হইয়াছে। হে ব্রাহ্ম ! এই শিক্ষাকে প্রাণপণে ধর্ম্মানুপ্রাণিত করিতে যত্ন কর, তাহা হইলেই আর ব্রাহ্মসমাজে নাস্তিকতা, নরপূজা অথবা অন্যবিধ নীচতর অনুষ্ঠান প্রবেশ করিতে বা তিষ্ঠিতে পারিবে না।

অনেকে মনে করে, যদি কি ভদ্র, কি ইতর, দেশের সকল লোকের শিক্ষালাভের উপায় হয়, তাহা হইলেই দেশে উদার শিক্ষা প্রচলিত হইল। বস্তুতঃ তাহা নহে। যে সমাজে ধনী ও নির্ধন, ভদ্র ও ইতর, স্ত্রী ও পুরুষ, কি সাহিত্য কি গণিত, কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি শিল্প, কি সঙ্গীত, সকল বিষয়ে অবাধে শিক্ষা লাভ করিতে অধিকারী, এবং যে সমাজে সক-

লেই নিজ নিজ শক্তি, অবস্থা ও রুচি অনুসারে শিক্ষা নির্ব্বাচন ও শিক্ষালাভ করিয়া সমুন্নত হইতে পারে, সেই সমাজেই উদার-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এইরূপ উদার শিক্ষাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ত সহচর

উপরে যে সকল সাময়িক প্রতিকূলতা বা অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করা গেল, ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ সহজেই উহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই সকল অস্থায়ী অসার কুজ্ঝটিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ নূতন সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল দীর্ঘকাল আবৃত থাকিবে না। অতএব আমরা প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ জীবনের স্ফূর্ত্তি ও বিক্রম আশানেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হই।

যখন বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তখনই তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারিলেও, উহা স্থায়ী হয় না। পরন্তু যদি প্রবল শীতে সাগরগর্ভ ঘনীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে বায়ু-প্রবাহ প্রবল হইলেও তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু জনসমাজরূপ মহাসমুদ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার প্রাণবায়ু-রূপ সত্যের প্রচার অজস্র ও নিত্য নূতন ভাবে প্রবাহিত। সেই তরঙ্গের গতিও উহার কার্য্যক্ষেত্ররূপ সাগরস্রোতের সম্পূর্ণ অনুকূল। আবার দেখ, জগতে উদার শিক্ষাপ্রণালীরূপ চির-বসন্তের উদয় হইয়াছে। এই বাসন্তী উত্তাপে জগতের আকাশ নির্ম্মল হইবে, সমাজ সমুদ্রের অজ্ঞানরূপ শীতলতা বিদূরীত

হইবে, আর ব্রাহ্মসমাজরূপ মহাতরঙ্গও পৃথিবী আন্দোলিত করিয়া, উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সমুত্তীর্ণ হইবে। হে ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণ! আর কতকাল উদাসীন থাকিবে? একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, সেই সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গ যে অচিরেই তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের জন্মভূমি ভারত-বর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

ব্রাহ্মগণ! নিরাশ হইও না, আশার সহিত দণ্ডায়মান থাক, উৎসাহের সহিত কার্য্য কর। যদিও এই কোটি কোটি লোকসমষ্টি-মধ্যে তোমরা অদৃশ্যবৎ, যদিও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই তোমাদিগকে গণনা করিতে পারি; ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীরা যাহাই বলুন, এক দিন পৃথিবী তোমাদিগের হইবে। মনুষ্য-সমাজরূপ মহাসমুদ্রে তোমরা কয়টী জলবিন্দু বই নও। কিন্তু তোমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া এই সমুদ্রে যে মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার আঘাতে সাগরের অনন্ত জলরাশি বিলোড়িত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাতরঙ্গ দেশ দেশান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া সকল মানবকে এক করিবে, এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম—চারিদিক্ হইতে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের মহিমা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

হেলেনাকাব্য—ইউরোপীয় কবিগুরু হোমারের মহাকাব্য ইলিয়দের বিষয় লইয়া রচিত। যে প্রতিভা-দর্শনে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "ইনি আমাদিগের দেশের এক উজ্জ্বল রত্ন হইয়া উঠিবেন," যে ভাষাকে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মেঘনাদবধের ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, হেলেনাকাব্য সেই প্রতিভা ও ভাষাতে সজ্জিত।

মিত্রকাব্য—যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, Bengal Magazine-সম্পাদক কবিকে wild nightingale বলিয়াছিলেন, সেই কবিত্বে মিত্রকাব্য সুশোভিত।

প্রেমানন্দকাব্য বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব পদার্থ। উহাতে রূপতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও প্রার্থনাতত্ত্বের সজীব মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমানন্দকাব্য উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের ভাণ্ডারস্বরূপ। এইরূপ কাব্য বঙ্গভাষায় দ্বিতীয় নাই।

বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশের স্থান নাই। নব্যভারত, Indian Mirror, Bengalee, সঞ্জীবনী ও সময় প্রভৃতির অভিমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠকগণ তদ্দ্বারাই গ্রন্থসমূহের গৌরব ও সৌন্দর্য্যের আভাস পাইবেন।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

সাহিত্য-সমাজের অভিমত।

We have been struck by the wonderful skill, which the poet has displayed in consecrating his poetry to the praise of religion and duty. * * Throughout are discernible a manly strength, a charming atmosphere of enhancing suggestions and a firm continuous music.

BENGALEE.

There should be none who would withhold from him the praise that is so emphatically his due for smoothness of diction, loftiness of conception and earnestness of purpose that characterise this remarkable production. "Bharat Mangal" The subject is as worthy of the treatment, as the treatment is worthy of the subject.

INDIAN MIRROR.

The creations of the poet live and move just as if they were made of flesh and blood, and while in their joys and sorrows, their triumphs and failures, the more thoughtful reader will profitably study the varied experiences of the spiritual life, the ordinary reader will find in them all that forms the common attractions of epic poems and works of fiction.

INDIAN MESSENGER.

The author is evidently a wild nightingale. We would advise the public not largely to patronize the author, for if he got a good deal of money, he would take his flight to England, and not regale us with his "Wood Notes Wild."

BENGAL MAGAZINE.

বাল্মীকি, ব্যাস এবং অন্যান্য পুরাণকারদিগের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ ভিন্ন বঙ্গভাষাতে মৌলিক মহাকাব্য আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যম এই ভারতমঙ্গল। ইহার কেবল পূর্ব্বখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বখণ্ডেই কবি কল্পনাকে দেশকালবন্ধন-মুক্ত করিয়া, অজর অমর সুখদুঃখ ও পাপপুণ্যাতীত অতি মহান, অতি উচ্চ মহাস্বর্গে এবং দুরবগাহ্য অন্ধকারময় নরকের গভীরতম প্রদেশে লইয়া গিয়াছেন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ত্রিলোকে ঘুরাইয়াছেন। * * এরূপ স্থলে কবি আনন্দচন্দ্রের বিচিত্র কল্পনা কিরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, কি মহারত্ন প্রসব করিতে সক্ষম, তাহা "হেলনা কাব্যের" পাঠক অবগত আছেন।

প্রেতপুরী এবং পূর্ব্বপাপের ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্তের যে হৃদয় বিশুষ্ককারী, অতি বীভৎস, অতি উৎকট মৌলিক (original) চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়!

ভারতমঙ্গল পূর্ব্বখণ্ডকে দাম্পত্য ধর্ম্মের মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। এক স্থানে দাম্পত্য ধর্ম্মের এমন সুবিস্তৃত এবং সুক্ষ্ম দার্শনিক মীমাংসাপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

নব্যভারত।

বহুদিন হইল মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের অমৃতময়ী বীণা নীরব হইয়াছে। অনেকেই দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, "সেই সুললিত বিহঙ্গকাকলি, গভীর মেঘ-গর্জ্জন এবং প্রচণ্ড দুন্দুভিধ্বনি আর শ্রুতি-গোচর হয় না; মাইকেল যে সুরে বঙ্গ-কাব্য-কাননে গান ধরিয়াছিলেন, সেই অমিত্রাক্ষরের মহাসংগীতে নূতন ভাবে, নূতন আবেগে, নূতন রসে কেহই গাহিতে পারেন না।" ভারতমঙ্গলকার বাবু আনন্দ-চন্দ্র মিত্র এই দুঃখ বিদূরীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইউরোপ বা আমেরিকায় হইলে, এরূপ কবির লক্ষ লক্ষ পুস্তক বিক্রয় হইত, এবং তিনি মানের সঙ্গে প্রভূত ধনও উপার্জ্জন করিতেন।

সময়।

কাব্য সংগ্রহে বিবিধ প্রকারের বহু সংগীত আছে। সে সকল গীতের অনেকগুলি বঙ্গদেশে সহস্র কণ্ঠে গীত হইতেছে। যাহা হেম বাবু, রবিবাবু, শিবনাথ বাবু, রামপ্রসাদ ও নিধু বাবুর রচিত বলিয়া লোকে জানিত, দেখিতেছি, তাহা কবি আনন্দচন্দ্রের রচিত!

কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসজনিত নানা ভাবে আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি, কবিকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

সঞ্জীবনী

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা-গেজেট, বান্ধব, সাহিত্য-পরিষৎ পত্র এবং এডুকেশন-গেজেট প্রভৃতি পত্রে এই সকল কাব্যের প্রচুর প্রশংসা করা হইয়াছে।